বাস্তুহারা

[বাস্তবের পটভূমিকায় অশ্রুজলের আল্‌পনায় আঁকা উপন্যাস]

স্বপনবুড়ো

কমলা বুক ডিপো
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসরোজনাথ সরকার এম্-এ, বি-এল্।
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

*   *   *   *

ছেপেছেন—
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস।
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

*   *   *   *

প্রচ্ছদপট ও ছবি এঁকেছেন—
শ্রীধীরেন বল

*   *   *   *

প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন—
মোহন প্রেস
২, করিস্ চার্চ্চ্ লেন, কলিকাতা।

*   *   *   *

বাঁধিয়েছেন—
অ্যালায়েড্ বাইণ্ডার্স্
৬৫, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম : চার টাকা মাত্র

যিনি

আমার পিতৃপুরুষের ফেলে-আসা

শূন্য ভিটায়—আজও সন্ধ্যা-

প্রদীপ জ্বাল্‌ছেন—আমার

সেই মাতৃসমা বড় বধূ-

ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে

"বাস্তুহারা" উৎসর্গ

ক'রলাম।

—নববর্ষ, ১৩৫৯ বংগাব্দ।

এক

গ্রীষ্মের অলস মধ্যাহ্ন। তুলসীতলা গ্রামখানি যেন চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। ফটিকদের আমবাগানে একটানা ঘুঘু ডেকে চলেছে।

গ্রামে দুপুর বেলাটা অনেক সময় এমন নিঝুম হয়ে থাকে যে, মনে হয় যেন দুপুর রাত !

দারুণ রৌদ্র-তাপে খাল বিল শুকিয়ে গেছে, গরু-মোষ গিয়ে যে একটু জলে গা ডোবাবে তারও উপায় নেই। ইস্কুল বন্ধ ; গাঁয়ের পথে একটি মানুষের দেখা নেই।

ক্ষেতে যারা কাজ করছিল তারাও এই ঠাটা-পড়া রদ্দুরে বিশ্রাম নিয়েছে বড় বট গাছটার তলায়। একটা চিল দারুণ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গাঁয়ের অনেক ওপরে ডেকে বেড়াচ্ছে, এমন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না যেখানে গিয়ে সে জলের তেষ্টা মেটাতে পারে।

মাঝে মাঝে পাগলা গরম হাওয়া শুক্‌নো গাছের পাতাগুলি ঘূর্ণিপাকে উড়িয়ে নিয়ে অকারণে খেলা করে বেড়াচ্ছে !

মনে হয় যেন সারাটা গ্রাম কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের পরশ পেয়ে একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

রতন রসিকতা করে জবাব দিলে, বারে! মিছিমিছি দাঁড়াতে গেলি কেন? দিব্যি গাছের ছায়ায় একটা ঘুম লাগাতে পারতিস। আমি এসে তোকে ডেকে তুলতাম।

ফটিক শুধোলে, আসল কথাটা বল! এত দেরী কেন?

—আর বলিসনে ভাই! পিসিমা বল্লে, আমসত্ত্ব পাহারা দিতে হবে উঠোনে। কাঁহাতক আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। যেই পিসিমার একটু চোখ জড়িয়ে এসেছে আর অমনি একছুটে পলায়ন। রতন জবাব দেয়।

কিন্তু আমসত্ত্ব যখন কাকে খেয়ে যাবে তখন কি বলবি?

রতন জবাব দিলে, আমার পালানোটা দিদি দেখেছে। আর আমি জানি দিদি আমসত্ত্ব পেলে আর কিচ্ছু চায় না। কাজেই আমসত্ত্ব যে খোয়া যাবে না সেটা তার হাত না গুণেই বলে দিতে পারি।

হো-হো-করে হেসে ওঠে ফটিক।—কিন্তু চাকু আর কাসুন্দী এনেছিস? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে!

রতন বল্লে, আসল কাজ আমি কখনো ভুলেছি দেখেছিস? এই নে চাকু, আর এই শিশি ভর্ত্তি কাসুন্দী--কত খাবি খা না'! কিন্তু বলে দিচ্ছি ঝালে চোখে জল এসে যাবে।

—আরে, চোখে জল না এলে আর মজা কি? আমের টকে জিব আসবে বেঁকে, আর কাসুন্দীর ঝালে চোখে আসবে জল—তবে ত খাওয়ার মজা! চোখ পিট পিট করে ফটিক জবাব দেয়।

রতন বুদ্ধি দিলে, চল এইবার গাছে উঠে গোটা কয়েক আম পেড়ে নিয়ে আসি—

প্রস্তাবটা ভালো, কাজেই তুজনে মাল কোঁচা মেরে গাছে উঠতে লাগলো।

কিন্তু কিছুদূর ওঠবার পরই বুঝতে পারলে ক্রমাগত লাল পিঁপড়ে ওদের তুজনের হাতে, পায়ে, গায় কামড়াচ্ছে।

ফটিক বল্লে, রতন, চল ভাই নেমে পড়ি। এভাবে যদি পিঁপড়ের কামড় খেতে হয় তবে গা ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে !

রতন বল্লে, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ঢিল মেরে যথেষ্ট আম পাড়া যাবে। সুতরাং তু'জনে ঝুপ ঝুপ করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

ঢিল সংগ্রহ করতে গাঁয়ের ছেলেরা ভারী ওস্তাদ। কেননা পল্লী-যুদ্ধের ওই হচ্ছে সব চাইতে বড় অস্ত্র।

খুব অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা অনেকগুলি বড় বড় আম অব্যর্থ ঢিলে বোঁটা থেকে খসিয়ে নিয়ে এলো।

রতন বল্লে, আয় এক কাজ করা যাক্—

ফটিকও কৌতূহলী চোখ তুলে শুধোলে, কি ?—

ওই যে কলা গাছ ওর থেকে একটা পাতা কেটে নিয়ে আয়। আমগুলি কুচি-কুচি করে কেটে নি, তারপর ওই কলাপাতায় কাসুন্দি দিয়ে মাখলে যা ব্যাপার দাঁড়াবে সেটা মুখে না বলাই ভালো।

রতন বিজ্ঞভাবে বল্লে।

মুখে কিছু বল্লে না বটে কিন্তু মুখ চট্‌কে ফট্‌কে উত্তর দিলে, তোর বুদ্ধিগুলো কিন্তু সত্যি ভালো। কিন্তু নুন এনেছিস ? নুন ?

একটা কাগজে মোড়া খানিকটা নুন্ পকেট থেকে বের করে নিয়ে রতন মিটি মিটি হাসতে লাগলো।

এর পর কলার পাতার ওপর কাসুন্দী মাখা আম যে ফলারের স্থষ্টি করল সেটা বুঝিয়ে না বললেও বেশ বোঝা যাবে।

দাঁত যখন টকে একেবারে শির্ শির্ করতে লাগলো তখন রতন বল্লে, চল ভাই, আমাদের জাম গাছে প্রচুর জাম পেকে রয়েছে। ভারী মিষ্টি। অনেকগুলো খেলে দাঁতের টক পালাতে পথ পাবে না।

ফটিক মাথা নেড়ে বল্লে, আমি ত আগেই বলেছি তোর বুদ্ধিগুলো ভারী মজাদার। চল, এখন কালো জামের বিরুদ্ধেই অভিযান সুরু করা যাক।

পল্লী পথ এখনও জনহীন।

অনেক দূরে মাঠের ওপাশ থেকে ধোপাদের কাপড় আছড়ানোর শব্দ ভেসে আসছে। একটা গাধা রদ্দুরে অস্থির হয়ে কোথায় যেন বিকট স্বরে ডেকে উঠলো। একটা ডোবার জল একেবারে শুকিয়ে গেছে, মাটিগুলিও ফেটে চৌচির। কোন দিন যে এটি জলে ভরাট ছিল আর এরি ভেতর থেকে ক্রমাগত ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙ্ শব্দ শোনা যেত সে কথা যেন মনেই আসে না।

কিন্তু রদ্দুরে ক্লান্তি নেই—ফটিক আর রতনের। ওরা জামগাছের উদ্দেশে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে।

রতন মিথ্যে কথা বলেনি!

ওদের জাম গাছ যেমন অনেক যায়গা জুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি জামগুলি বড় আর কালো। পেকে টুল্ টুল্ করছে। আর অসংখ্য পক্ষি-পাখালি মনের আনন্দে কিচির মিচির করে সেই গাছে আসর জমিয়েছে। পাখীতে যত না খায় তার বেশী

—বৈজ্ঞানিক হওয়া কি চারটেখানি কথা নাকি রে? অনেক মোটা মোটা বই পড়তে হয়, কত কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হয়। এর জন্য কত জীবন চলে যায়। বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্যিই তপস্যার ব্যাপার।

গাছের ওপর থেকে রতন জিজ্ঞেস করলে, এত কথা তুই জানলি কি করে রে ফটকে? পড়িস তো গাঁয়ের ইস্কুলে।

ফটিক বল্লে, আমার মামা কলেজে পড়ে যে। মাঝে মাঝে আসে আমাদের দেশে বেড়াতে। তার কাছেই বিজ্ঞানের সব খবর শুনে নি।

হঠাৎ রতন বলে বসল, তোদের আম খেয়ে যা দাঁত টকে গিয়েছিল, আমাদের মিষ্টি জাম খেয়ে এতক্ষণে মুখটা মিষ্টি হ'ল। বাবা, এমন টোকো আমের বাগান তোরা কেন রাখিস—বলতে পারিস?

রতনের কথাটায় ফটিকের ভারী অপমান বোধ হল। বল্লে, নারে বোকা, এখন কাঁচা আছে, পাকেনি তাই, নইলে দেখবি ওই আম একেবারে চিনির মতো মিঠে হবে।

ছাই হবে, ফোঁড়ন কাটে রতন। ওই টোকো আম কখনো মিষ্টি হতে পারে? সেদিন পণ্ডিত মশাই একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেছিল মনে আছে? তার মানে হচ্ছে, কয়লা শতবার ধুলেও তার ময়লা যায় না।

এইবার চটে-মটে ওঠে ফটিক। বল্লে, তার মানে, তুই বলতে চাস যে আমাদের বাগানের আম ভালো নয়? পাকলে তা' মিষ্টি হয় না?

—টক কখনো মিঠে হয়? হো-হো করে হেসে ওঠে রতন। দেখ ত' আমাদের জাম। খেলে মুখ, জিব, পেট সব জুড়িয়ে যায়।

—ফের আমাদেব আমের নিন্দে করবি?

—করবই ত—

—মুখ সামলে কথা বলবি।

—কেন, তোর ভয়ে নাকি?

—আমি বলছি আমাদের আম খুব মিষ্টি—

—আমি বলছি আমাদের জামের কাছে সেটা একেবারে টক।

—ভালো হবে না কিন্তু বলছি।

—মন্দটাই বা কি হবে শুনি?

গাঁয়ের ছেলেরা সহরের ছেলেদের মতো কথার মার-প্যাঁচ খুব বেশীক্ষণ চালাতে পারে না। রাগ হলে ঝোঁকের মাথায় যাহোক একটা করে বসে। ফটিকও তাই আর কথা কাটাকাটি না করে একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল গাছে বসা রতনের দিকে। সেটা লাগল গিয়ে রতনের পায়ের গোড়ালীতে।

ব্যথা পেয়ে চটে গিয়ে সে ক্রমাগত দুই হাতে জাম তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

ফটিক তাকে সাবধান করে দিয়ে বল্লে, ভালো চাস ত বল যে আমাদের আম মিষ্টি—

রতন বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জবাব দিলে, বয়ে গেছে আমার টোকো আমকে মিষ্টি বলতে। মিষ্টি বলতে হয় আমাদের জামকে; তবে হ্যাঁ, পাঠশালায় পড়েছি বটে—কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা হইলে তাহারা মনে বড় কষ্ট পায়!

যাবার ? আমাদের বাগানের ফল কে খায় তার ঠিক নেই ! আমরাই ত' দু'হাতে বিলিয়ে দি সবাইকে—

—তোমাদের টাকার গরম হয়েছে তাই আমায় কথা শোনাচ্ছ ? কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি—ফট্‌কেকে তোমরা শাসন করো। সে যেন খবরদার আমার ভাইপোর সঙ্গে মেশেনা—

চণ্ডীচরণ ফোঁস করে উঠে জবাব দিলে, তার চাইতে রতনাকে আপনি আগে সাম্‌লান। ও যেন যখন-তখন আমাদের বাড়ীতে না আসে।

—বেশ তাই হবে।

—হলে অযথা নালিশের হাত থেকে আমরাও বাঁচি।

—আর কখনো রতন যাবেনা তোমাদের বাড়ী—

—ফট্‌কেরও বয়ে গাছে বাড়ীর বার হতে—

—হুঁ।

—আচ্ছা !

দুজনের কথা আস্তে আস্তে ছোট ও সংক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। হাট করে ফেরবার মুখে দুজনকে একই নৌকায় নদী পার হতে হল। কিন্তু রতনের জ্যেঠা গিয়ে বসলেন নৌকার এর গলুইতে, আর চণ্ডীচরণ তাকিয়ে রইল অন্য এক দিকে।

যেন ভিন্ গাঁয়ের লোক ওরা। কারো সঙ্গে কারো জানা শোনা নেই।

কিন্তু নৌকা থেকে নেমেই দুই বাড়ীর দুটি অভিভাবক এক নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখে পড়ে গেল। যাদের জন্যে এত ঝগড়া আর বিবাদ, সেই দুই শ্রীমান রতন আর ফটিক কোন গেরস্তর একটা ছাগল

ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাকে আশ মিটিয়ে কাঁঠাল পাতা খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু অজ-নন্দন এত অবুঝ যে, সে এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলে যেন বাঁচে। মাঠে মাঠে ঘুরে শুকনো ঘাস চিবুবে, সেও বরং ভালো, তবু আদরের অতিশয়োক্তি তার পক্ষে অসহ্য!

রতন আর ফটকে যে অসাধ্যসাধনে ব্যস্ত ছিল তাতে অন্য দিকে তাকা-বার ফুরসৎ ওদের মোটেই ছিলনা।

এই সহজ কথা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে, তাদেব আদর করে যখন কেউ কলা কিম্বা করমচা খেতে দেয়, দুটোকেই ওরা একই ভাবে আনন্দের সঙ্গে হাত পেতে নেয়। কিন্তু এই ছাগলটা কী! এতকষ্ট করে ওরা দুটিতে গাছে উঠে কচি কাঁঠাল পাতা

জোগাড় করে নিয়ে এলো, আর ও কিনা সেগুলো একবারটি চেখেও দেখবেনা !

এই জন্যেই বোধ করি ওদের নাম হয়েছে—ছাগল !

ছাগল সম্পর্কে হয়তো দুজনে বেশ কিছু গবেষণা চালিয়ে যেতো, কিন্তু আচম্‌কা দুজনের পিঠে দুটি চাপড় এসে পড়তে ওরা একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল।

শুধু চাপড়েই পালার শেষ নয়.......দুটি বলিষ্ঠ হাত ওদের কান দুটি পাক্‌ড়ে ধরল—একেবারে নিঃশব্দে।

রতনের জ্যাঠা বল্লেন, চল্ শীগ্‌গির বাড়ী। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। রোদ্দুরে টো-টো করে যত রাজ্যের বখাটে ছেলের সঙ্গে মেশা আমি তোর বের করে দিচ্ছি—

ফটিকের কাকার মুখেও ঝাল কিছু কম নেই। আড় চোখে রতনের জ্যাঠার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ফটকেকে বল্লে, যত সব হা-ঘরের ছেলের সঙ্গে তোর মেলা-মেশা ! কেন গাঁয়ে কি ভদ্রলোক নেই ! আজ তোকে ঘরে বন্ধ করে রাখবো···দেখি শায়েস্তা করতে পারি কি না।· সঙ্গে সঙ্গে দুই অভিভাবকের কীল পড়ল ভাদ্রের তালের মতো দুই শ্রীমানের পিঠে।

এই ভাবে যার যত রাগ চড়ে ওঠে, সে তার বাড়ীর ছেলেকে বেদম প্রহার দেয়, আর বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে চলে !

রতন আর ফটিক কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না···হঠাৎ এমন কি অন্যায় কাজ তারা করে বসল, যার জন্যে এতখানি উত্তম-মধ্যম তাদের জন্যে জমা হয়ে ছিল !

দুটি শ্রীমানকে নিয়ে ঘরে পৌছার পর, বাড়ীর লোকদের

ফটিক কান খাড়া করে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু শরীরটাকে এমন ভাবে আড়াল করে রাখল, যেন কেউ চট্ করে দেখতে না পায়।

মা বললে, আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমরা যে বলছ রতনের অসুখ, সেটা কি সত্যি বাড়াবাড়ি?

—হুঁ। একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি। গাঁয়ের শিবচরণ কবরেজমশাই দেখছেন কিনা।. তাঁর সঙ্গে আজ হঠাৎ হাটে দেখা। বললেন, এই ক'দিনের মধ্যেই ছোঁড়াটা এ-েবারে শুকিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে আবোল-তাবোল কি সব বকে আর কেবলি আমাদের ফটিককে ডাকে।—মৃদুস্বরে চণ্ডী জবাব দেয়।

মা আঁচলে চোখের জল মুছে খাটো গলায় কইলে, ছেলেতে ছেলেতে ঝগড়া হয়েছে···এবেলা হয়, ওবেলা মিটে যায়! কিন্তু তোমরা ব্যাপারটাকে বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলছো ঠাকুরপো।

চণ্ডী জবাব দিলে, আমাদের কি দোষ বল? রতনের জ্যেঠা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে কিনা, যত রাজ্যের বখাটে ছেলের সঙ্গে মেলা-মেশা আমি তোর বের করে দিচ্ছি! কথাটা যে আমাদের গায়ে লাগে বৌদি! আমিও শুনিয়ে দিয়েছি, গাঁয়ে কি ভদ্দর লোক নেই? হা-ঘরের ছেলেদের সঙ্গে তোর মেলামেশা?

মা আগের মতোই মৃদু কণ্ঠে উত্তর করলে, বেশত! তোমাদের জবাবে ত' কাটা-কুটি হয়ে গিয়েছিল! মিছি-মিছি ছেলে দুটির ওপর অতখানি তাড়না যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

চণ্ডী কাকা রাগ করে উত্তর দিলে, বেশ! তোমার ছেলেকে তুমি খুলে দাও। কিন্তু এর মধ্যে আমাকে আর কোন দিন জড়িও না।

মা কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে, বা রে! আমি কি তাই বলেছি? ওর যাতে ভাল হয়, তোমরা ত তাই করবে। তোমরা শাসন বন্ধ করো— এ কথা আমি কোন দিনের তরে বলেছি?

– হ্যাঁ, আরো কিছুদিন বন্ধ থাক ফট্‌কে, তাহলেই রতনা ছোঁড়াটার সঙ্গে মেলা-মেশা একেবারে থাকবে না। আর তাছাড়া এখন থেকে পড়াশুনায় মন দিতে হবে না? সারাদিন বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ালেই তোমার ছেলে মানুষ হবে মনে করেছ, বৌদি? কাল থেকে আমি ওকে পড়াতে বসবো। ছেলে যদি অমানুষ হয়, তবে বাড়ীরও ত' বদনাম বৌদি—

মা জবাব দিলে, সে কথা ত' ঠিকই ঠাকুরপো। তুমি যা ভালো বোঝো সেই ভাবেই ওকে-মানুষ করে তোলো।

মনে হল এইবার চণ্ডীকাকা খুশী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রতনের অসুখ!

ফট্‌কে কিন্তু এতদিন কোন খবরই পায়নি—

মাছগুলো জালে আটকা পড়লে যেমন জলে ফিরে যাবার জন্যে ছট্‌ ফট্‌ করতে থাকে, ফটিকের অন্তরাত্মা ঠিক তেমনি রতনের কাছে ছুটে চলে যাবার জন্য কেবলি আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় নেই!

দুপুর বেলা চণ্ডীকাকা ধারাপাত মুখস্ত করাতে বসে গেল।

কিন্তু যাতে মন নেই, তা' মুখস্ত হবে কি করে?

ফলে ফটিকের কতকগুলি চড়-চাপড় আর কান-মলা লাভ হল।

চণ্ডীচরণ বই খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফটিকের মাকে ডেকে বল্‌লে,

ফটিক মরিয়া হয়ে এগিয়ে চলে।

গোটা বাড়ী নিঝুম। শুধু রতনের মা ছেলের শিয়রে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছে। মৃদু মাটির প্রদীপে দেখা গেল রতনের মুখ কালীমাখা হয়ে গেছে। সে মুখে কেবলি বিড় বিড় করছে, ফটিককে তোমরা ডেকে দাও না—কালীদের বিলে নৌকা বাইতে যাবো—

ফটিক ছুটে গিয়ে রতনের শয্যার পাশে বসে তার ডান হাতখানি টেনে নিয়ে বললে, ভাই রতন, আমি এসেছি, আর তোর ভাবনা নেই।···

রতন খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে, শীর্ণ মুখে হাসি কিন্তু ওর চোখে জল!

সকালে বিকালে দেখা হলেই লোকের মুখে ওই একই প্রশ্ন : ক' হাত জল বাড়ল ?

—খাল বেয়ে অনেকটা দূর এসে পড়েছে —

— আর ক'দিনের ভেতরই গায়ের ভেতর ঢুকে পড়বে।

—রাত্তিরে কি রকম শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠে শুনতে পাস ?

—আমার ত ভাই চার বার করে ঘুম ভেঙে যায়।

"পল" "ক্ষ্যাপাজাল" "ট্যাটা" সব তৈরী করে রেখেছি—

শুধু মুখে মুখেই উদ্যোগ-পর্ব্ব নয়। উৎসাহী ছেলের দল খালের মাঝে মাঝে রাতারাতি বাঁধ দিয়ে রাখে মাছ ধরার সুবিধার জন্যে। দল বেঁধে পালা করে সব রাত জাগতে সুরু করে দেয়। পাড়ায় পাড়ায় বসে যায় তাসের আড্ডা। কখন যে শুভ লগ্ন আসবে কে বলতে পারে ? অনেকেই রাত্তিরে শিয়রে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখে। কখন ডাক পড়বে···ছুটে বেরিয়ে খালের মাঝখানে চলন্ত স্রোতে যায়গা করে নিতে হবে ত !

কার পুকুরে কবে জল পড়বে—গাঙের জলের বাড়া-কমা দেখে তার একটা হিসেব প্রত্যেকেরই মুখে-মুখে তৈরী হয়ে থাকে।

এই সময় রাত্তিরের ঘুমটা অনেকেই বিসর্জন দিয়ে বসে। গাঁয়ের মেয়েরা অবধি সবাই তৎপর হয়ে বসে থাকে। কখন থেকে খালই ভর্ত্তি মাছ আসতে সুরু করবে। অনেকে দু'মাস আগে থেকে সরষের তেল জমাতে সুরু করে দেয়, ঝাল, ঝোল, ভাজা, অম্বল—একেবারে যাকে বলে মাছের পঞ্চ-ব্যঞ্জন তৈরী হতে থাকবে। এই সময় পল্লীগ্রামের লোকেরা কোনো তরী-তরকারীর ধার ধারে না। মাছে যখন অরুচি ধরে যায় তখন সুরু হয় ডাঁটা আর কাঁঠালের বীচির তরকারী।

একদিন নিঝুম গ্রীষ্মের নিশীথ-রাতে ফটিকের বাইরের ঘরের জানালায় টোকা পড়ে—টক্-টক্ টক্—

—ফটিকের কান সজাগই ছিল। তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠে বিছানায়। এই বয়েসটাই এমন যে একটা চাঞ্চল্যকর কিছু করতে পারার জন্যে দেহ আর মন একেবারে উৎসুক হয়ে থাকে :

রতন ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ফটিক, উত্তরের চক দিয়ে জল এসে সেনেদের বাড়ীর পুকুরে পড়ছে, মাছ ধরতে চাস্ ত' শীগ্গির চলে আয়।

ফটিক জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে শুধু রতনই নয়; পাড়ার ঘণ্টে, চটপটি, মাকুন্দো, ষষ্টি, টোনা, ছায়েদ মিঞা অনেকেই আছে।

ঘরের এক কোনে "পলটা" ঠ্যাকানো ছিল, খালৈ ছিল বেড়ার গায়ে ঝোলানো, হু'টো তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে—লণ্ঠনটাও তুলে নিলে, তারপর নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সবাই এগিয়ে চলেছে সেন বাড়ীর খালের দিকে।

বহু দূর থেকেই দেখা যাচ্চে—অনেকগুলি আলো নড়াচড়া করে ফিরছে খালের মধ্যিখানে আর তার উঁচু হু'পাড়ে।

ফটিক অবাক হয়ে দেখলে, এই নিশুতি রাতে এরই মধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গেছে—নানা বয়েসের, নানা ধর্ম্মের। শুধু রাধেশ্যাম বৈরাগীর আখড়া থেকে কেউ আসেনি--যেহেতু ওরা বৈষ্ণব। কিন্তু মজা এই যে, মাছ যারা খায়, তারাও মালপো ভোজের দিন বত্রিশপাটি দাঁত বের করে প্রসাদের লোভে গিয়ে আখড়ায় হাজির হয়।

অন্ধকারে বেমালুম কেটে দিয়েছে ! সব মাছ যে বেরিয়ে গেল পুকুর থেকে ! ওরে বিষ্টে, ওরে বৈকুণ্ঠ, শীগ্‌গীর ছুটে আয়—

কিন্তু বিষ্টে আর বৈকুণ্ঠ ছুটে আসবার আগেই ছেলের দলের একেবারে পোঁ-পোঁ করে পলায়ন ! পেছন থেকে ছায়েদ একরাশ লণ্ঠন দু' হাতে ধরে ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগলো—

ওরে ফটকে—ওরে টোনা, একটু দাঁড়িয়ে যা, নইলে আমায় একা পেয়ে বুড়ো একেবারে তক্তা বানিয়ে ছাড়বে !

চার

তুলসী-তলা গ্রামের ছেলের দল রথ-তলার মেলার জন্যে দিন গুন্‌ছে।

প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী উঁচু রথ। গ্রামের জমিদারেরা সাত পুরুষ আগে তৈরী করে দিয়ে গেছেন···কিন্তু এখনো একেবারে অটুট আছে এমন শক্ত এর কাঠ এবং এমন সুন্দর এর কারু-শিল্প !

সারা বছর ধরে রথটি একটি টিনের ঘরের মধ্যে আত্ম-গোপন করে থাকে···জগন্নাথের ভক্তদল যখন রথের দড়িতে টান দেয়, তখন ঠাকুর বেরিয়ে আসতে পথ পান না ! সামনেই বিরাট মাঠ। একপাশ দিয়ে চওড়া খাল বয়ে গেছে। ওই বিরাট মাঠে মেলা বসে যায়। আশে-পাশের বহু অঞ্চল থেকে দোকানী-পসারী এসে মেলাকে জাঁকিয়ে তোলে। নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল, পুতুল নাচ, পাঁপড় ভাজার দোকান, রঙ বেরঙের খেলনা, পাতার বাঁশী, কাপড়ের দোকান, হাঁড়ি, কুঁজো, কলসী কিছু আর বাদ থাকে না। তেলে ভাজা জিনিষ

আর পাঁপড় ভাজার গন্ধে ছুটে আসে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ের দল ; মাঠে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না।

কিন্তু রথের অনেক দিন আগে থেকেই ছেলের দলের কাছে আর একটি মস্ত বড় আকর্ষণ আছে সেটি হচ্ছে "লটকা"। ওপরে খোসা, ভেতরে লাল লাল কোয়া, চমৎকার টক ফল। রথের কিছু আগেই তুলসীতলার আশে-পাশে এই ফল পাকতে সুরু হয়। ছেলেরা কাঁচা অবস্থা থেকেই চুরি করে এনে খেতে থাকে, আব বলে, লটকার মধ্যে রথের গন্ধ পাওয়া যায়। লটকা আর রথ— দুটো এমন ভাবে ছেলেদের মনকে আকর্ষণ করে যে, একটিকে বাদ দিয়ে আর একটীর কথা ভাবতে পারা যায় না! তাইত লটকা ফলের সঙ্গে সঙ্গে রথের দিনের ভাবী মেলার জন্য সকলের মন তৈরী হতে থাকে।

এই গাঁয়ের একান্তে ছেলেদের এক দরদী বন্ধু আছেন, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু। এই মৃত্যুঞ্জয়বাবু নিজের বাড়ী থেকে বিশেষ বের হন না। গ্রামের প্রাচীন লোকদের কাছে শোনা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্বদেশী যুগের একজন নামকরা বিপ্লবী। এঁদের দলের ডাকাতির কাহিনী এখন প্রায় গল্প-কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ঘর এক সময় ছেলে-পুলে, নাতি-নাত্নিতে ভর্ত্তি ছিল। কিন্তু এখন একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। দু'জনেরই বয়েস হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বাবু সারাদিন নানা রকম স্বদেশী-বিদেশী বই পড়েন, বাগান করেন, আর ছেলের দল গেলে তাঁদের কাছে স্বদেশী যুগের নানা রকম গল্প করেন।

শোনা যায় জেলে অমানুষিক অত্যাচার করে পুলিশ তাঁর একটা কনুই ভেঙে দিয়েছে। তবু তিনি দলের কারো নাম পুলিশের কাছে

উচ্চারণ করেন নি। এখন তিনি অবসর সময়ে নানারকম মাটির খেলনা তৈরী করে আপন মনেই তাতে রঙ্ লাগান, কিন্তু ছেলেরা চাইলে তাদের মধ্যে দু'হাতে বিলিয়ে দেন। এই আপন ভোলা সদাশিব মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছোটদের একটা মস্ত বড় আশ্রয়স্থল। ছোটদের সব কিছু অত্যাচার ও আব্দার তিনি নীরব-হাস্যে সহ্য করেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছ থেকে ছেলেদের ডাক এসেছে—ওরা ত' সবাই মহা খুসি। নিশ্চয়ই কোনো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার! নইলে মৃত্যুঞ্জয়বাবু হঠাৎ ডেকে পাঠাবেন কেন?

ছেলের দল একসঙ্গে জোট বেঁধে তাঁর উঠোনে ঢুকলো।

ফটিক ত' প্রাণের আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, জ্যাঠাইমা, কি গড়েছ? আমাদের যে আর সবুর সইছে না।

বারান্দার এক কোনে বসে মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটি নতুন তৈরী পুতুলে রঙ্ দিচ্ছিলেন, হো-হো করে হেসে উঠে বল্লেন, আজ আর কোনো ব্যবস্থা নেই ফটিক। তোমরা এসে আমার কাছে বারান্দায় বোসো। আজ তোমাদের কাছে একটা কাজের কথা বলব।

সবাই গোল হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসল।

রতন শুধোলে, আপনাদের স্বদেশী যুগের গল্প শুন্‌বো—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু রঙ্ করা বন্ধ করে চশমাটিকে কপালের ওপর তুলে বল্লেন, সে আর একদিন হবে বাবা। ও গল্প কি আর শেষ হয়? কিন্তু আজ হবে কাজের কথা—

টোনা বল্লে, আচ্ছা, তাহলে কাজের কথাই বলুন।

চট্‌পটি ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, আজ খাওয়াটা মাটি হল দেখছি।

ফটিক উৎসাহিত হয়ে বল্লে, আচ্ছা আপনি আমাদের কাজের

মাকুন্দ শুধোলে, কি কাজ বলুন না—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, একটা টিনের চালা তোমরা সাময়িক ভাবে তৈরী করে নেবে। ছেলেরা হাতে-হাতে খাটলে ছোট-খাটো একটা টিনের ঘর তোলা কিছু শক্ত নয়। লালসালুর ওপর সাদা কাপড় কেটে তাতে লিখবে 'অনুসন্ধান কেন্দ্র।' এই মেলাতে এসে বহু ছেলে-মেয়ে আর বৌ-ঝি সঙ্গী-সাথীদের হারিয়ে মহাবিপদে পড়ে। অনেক সময় দুষ্ট লোকের হাতে গিয়েও লাঞ্ছিত হয়। তোমরা যদি হারানো ছেলে-মেয়েদের সন্ধান করে এইখানে জড়ো করে রাখো তবে, অনেক বিপদের হাত থেকে তারা বাঁচবে। মাঝে মাঝে চোঙা দিয়ে মেলার মধ্যে বলবে যে, যারা সঙ্গী-সাথীদের হারিয়েছে তারা এইখানে এসে আশ্রয় নাও। এই ভাবে পরের উপকার করতে পারো তোমরা।

ঘণ্টে বল্লে, এটা খুব ভালো কাজ; আমি আর চট্‌পটি গোটামেলা চ'ষে ফেলে হারানো ছেলে-মেয়েদের খুঁজে নিয়ে আসবো।

—আরো একটা কাজ যদি তোমরা করতে পারো তবে ত' কথাই নেই—মৃত্যুঞ্জয়বাবু তৃপ্তির সঙ্গে প্রশ্নটা তুললেন।

ফটিক বল্লে, আপনি বলুন, আমাদের কষ্ট হলেও সে কাজ থেকে আমরা পিছিয়ে আসবো না। শুনতে বেশ ভালো লাগছে আপনার পরিকল্পনাগুলি। চুপচাপ ঘরের ভেতর বসে থেকে আপনি দেশের লোকের জন্য এত কথা ভাবেন ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ফটিকের এই কথার জবাব দিলেন না। শুধু মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন ; তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, কাজের কথাটা না হয় শেষ করেই ফেলি।

সবাই সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বল্লে, সেই ভালো।—প্রাথমিক

ইতিমধ্যে জ্যেঠাইমা যে কখন এক ধামা মুড়ি তেল-নুন দিয়ে মেখে নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন, তা' আলোচনার জন্যে কেউ টের পায়নি। পাশে আর একটি পাথরের বাটিতে রয়েছে নারকেল টুকরো আর আঁখি গুড়।

এই মুড়ি জ্যাঠাইমার যে নিজ হাতে ভাজা সে কথা ছেলের দল সবাই জানে। চট্‌পটি দেখতে পেয়েছে সকলের আগে। সে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বল্লে, অ্যাঁ! তবে নাকি খাবার কিছু নেই? আমি জানি জ্যাঠাইমার ভাঁড়ার খুঁজলে কিছু না কিছু মিলবেই।

আর সবাই বিশেষ কথা কাটাকাটির মধ্যে গেল না, গোল হয়ে বসে হাতের সঙ্গে মুখের কাজ নীরবে সুরু করে দিলে।

খানিক বাদে দেখা গেল—পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে এমন একটি টুক্‌রোও ধামা কিংবা বাটির মধ্যে পড়ে নেই!

গুড়ের বাটি শেষকালে চাটতে চাটতে চট্‌পটি সকলের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বল্লে, এইবার কাজে খুব জোর পাওয়া যাবে।

রথের দিন এগিয়ে এলো।

সেই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হত ছেলেদের আনন্দ আর উদ্দীপনা।

এবার শুধু মেলা দেখা, রথ টানা, আর কলা খাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সংগঠনমূলক কাজে ছককাটা ব্যবস্থা।

মেলার মাঝখানে ছোটদের তৈরী "সেবাকেন্দ্র" "অনুসন্ধান কেন্দ্র" সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুধু তাই নয়—সামান্য গল্পের ভেতর দিয়ে যার সূত্রপাত হয়েছিল, সেই ছোটদের প্রচেষ্টা গোটা মেলার

ইতিমধ্যে ছুটোছুটির ফলে গোটা মেলায় একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটাকেও আয়ত্বে আনতে হল! কয়েকটি ছেলে মেয়ে লোকের চাপে জখম হয়েছিল। সেবা বিভাগে তাদের ধরাধরি করে এনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল।

ফটিক এসে খবর দিলে, খাবারের দোকানের দোকানীর ডান হাতটা পুড়ে গেছে…সে একটা গাছ তলায় পড়ে ধুঁক্‌ছে। স্বেচ্ছাসেবকের দল খবর পেয়ে সেইদিকে তৎপরতার সঙ্গে ছুটে গেল। এর চট্‌পট্‌ যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে ফেল্ল।

সন্ধ্যো বেলায় ছেলেদের মুখে সব খবর শুনে মৃত্যুঞ্জয় বাবু হেসে বল্লেন, এইবার তোমাদের একটি সত্যিকারের খাওয়া পাওনা হ'ল আমার কাছে!

এই নৌকো বাচ্ নিয়ে সারা গাঁয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, চোখে না দেখলে সেটা বুঝে ওঠা শক্ত।

'হেঁইও জোয়ান্', 'সাবাস্ জোয়ান্'—ধ্বনিতে সারা জলভূমি মুখরিত হয়ে ওঠে। মেয়েরা খৈ ছিটিয়ে দেয়, মঙ্গলশঙ্খ বাজায়, গামছা উড়িয়ে লোকেরা দু'পাড় থেকে উৎসাহ দেয়···আর যে দল নৌকো বাচে জেতে, গ্রামের লোক চাঁদা তুলে তাদের নতুন ধুতি ইনাম দেয়। হিন্দু-মুসলমান সবাই হাসিমুখে সেই নতুন ধুতি নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

এই নৌকো বাচ্‌কে কেন্দ্র করে জলের ধারে ধারে কত যে রকমারী দোকান বসে যায় তার সীমা সংখ্যা নেই। মিঠা পানির দোকান, তেলে ভাজা জিলিপির দোকান, পান বিড়ির দোকান, খেলনার দোকান, লটকার দোকান। সবাই প্রাণপণে চীৎকার করে, আর গরম জিলিপি কিনে খায়। বলে, গলাটাকে ঠিক রাখতে হবে ত'!

নৌকোয় যারা বাচ খেলে, তারাও যাবার সময় নতুন হাঁড়ি মেলা থেকে কিনে জিলিপি ভর্ত্তি করে নিয়ে যায় বাড়ীর জন্যে।

তারপর সাতদিন ধরে গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে চলে সমালোচনা। ক্ষেতে কাজ করতে করতে হুকো টানে আর কৃষাণেরা বলে, 'পশ্চিম পাড়ার বেউলোর' গান এবার বড় ভাল হয়েছিল। সত্যি, চোখ ভরে জল আসে। আর কালীয় দমন? আর একজন ফোঁড়ন কাটে। আমার ছেলেটাই ত' শ্রীকৃষ্ণ সেজে দাঁড়িয়েছিল। কি সুন্দর মানিয়েছিল আমার ব্যাটাকে।

আর একজন কৃষক আবার ধমক দিয়ে বলে, আরে নিজের ব্যাটার

মৃত্যুঞ্জয়বাবু। আচ্ছা, আমারও নাম জনার্দ্দন সরকার—দেখে নেবো!

বিশু খুড়ো তাকে শান্ত করে বল্লেন' আরে ভায়া, চোটোনা, বোস বাপ-ব্যাটার মধ্যে ঝগড়া যে তুমিই লাগিয়ে দিয়েছ,·আর তুমিই যে মাঝখানে বসে কলকাটি নাড়ছ, সেটা কি ছেলেদের অজানা থাকে ভেবেছ? খামোকা ওদের ঘরের অতগুলো জমানো টাকা উকিল মোক্তারে লুটে পুটে খেলে। তার চাইতে আমি বলি কি, এইবেলা মিটিয়ে ফেল। ওই গাঁয়ের ছেলের দল আবার তোমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে মিছিল বের করবে।

আম্‌তা আম্‌তা করে জনার্দন সরকার জবাব দিলে, কিন্তু মেটাতে চাইলেই কি মেটে? ভারী শক্ত মামলা! একেবারে জট্‌ পাকিয়ে গেছে। এ গেরো খোলা কি সোজা কাজ দাদা?

বিশু খুড়ো কাউকে খাতির করে কথা কয়না তাই বল্লে, তার মানে তোমারও বেশ দুপয়সা ঘরে আসছে এই মামলা মোকর্দ্দমার নাম করে! কাজেই তুমি মিটিয়ে ফেলতে দিচ্ছ না। এখনো বলছি, যদি ভালো চাও ত' বাপ-ব্যাটায় মিল-মিশ করিয়ে দাও। নইলে ওই ছেলের দলকে আমি লেলিয়ে দেবো তোমার পিছনে!

—সে কি কথা! সে কি কথা! তোমরা আপনার জন, এমন ভাবে লাগ্‌লে আমার ত' আর গাঁয়ে বাস করা চলেনা!

বিশু খুড়ো হাসতে হাসতে জবাব দিলে', সোজা পথে চলো—গাঁয়ে আম দুধ খেয়ে মনের আনন্দে বাস করতে পারবে।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলে বসলেন, ছেলেদের সবাইকে লাঠি খেলা

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ধমক দিয়ে জবাব দেন, কেন পারবে না? ওই ননীর দেহকে তুমি লোহা করে গড়ে তুলবে। তবে বুঝব তোমার ক্যারামতি!

ছয়

প্রতিদিন বিকেলবেলায় ছেলেদের একটা বিরাট দল ছু'তিনখানা নৌকো নিয়ে নদীর পথে পাড়ি জমায়, একজন করে হাল ধরে আর সবাই ছপ্-ছপ্ করে ছোট বৈঠে ফেলে তালে-তালে। কণ্ঠে তাদের তখন গান জেগে ওঠে ঃ—

"আমি ভয় করবো না—
ছু' বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।
তরীখানি বাইতে গেলে—
মাঝে মাঝে তুফান মেলে!
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—
কান্না কাটি কোরবো না"

খালের ছুপাশের চাষাদের ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে তাদের সমবেত গান শুনে···নৌকো তীরবেগে এগিয়ে চলে নদীর দিকে।

খাল আর নদী যেখানে মিশেছে, সেখানে প্রবল স্রোতের টানে বড় বড় মহাজনী নৌকোগুলি পর্য্যন্ত হিম্‌সিম্ খায়।

বড় নদীতে পড়বার মুখে হালের ছেলেরা চীৎকার করে ওঠে 'হুঁসিয়ার!' এই সময় নৌকোকে ঠিক মত বাগে রাখতে না পারলে ভাটির টানে সেই কোন্ দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই সবাই-কার সমবেত প্রচেষ্টায় নৌকোগুলিকে উজানের পথে পাড়ি দিতে হবে তবেই ফেরবার সময় তাদের এতটুকু বেগ পেতে হবে না। সন্ধ্যা বেলা ঘর মুখো হবার পালা। নদীর একটা জায়গায় চমৎকার একটী দ্বীপের মতো আছে। চারদিক দিয়ে জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

কাশ ফুল আর সবুজ ঘাসে জায়গাটা ভর্ত্তি। একটা প্রকাণ্ড বট গাছ নদীর দিকে হেলে পড়ে যেন দর্পণে নিজের ছবি দেখছে।

রতন হাততালি দিয়ে বল্লে, এই দ্বীপের মধ্যে একদিন বন-ভোজন করলে বেশ হয়!

খাওয়ার নামে সকলকার জিবই রসালো হয়ে উঠল। ফটিক বল্লে, মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে ব্যাপারটা জানানো হোক। তিনি ত' আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে, রথের মেলায় যদি আমরা ভালো করে স্বেচ্ছা-সেবকের কাজ করি তবে একদিন আমাদের কপালে ভোজ জুটবে। ঘণ্টে লাফিয়ে উঠে বল্লে, ঠিক কথা মনে করেছিস ভাই ফটিক! সে খাওয়াটার কথা ত ভুলেই গিয়েছিলাম।

ষষ্ঠি ছিল হালে। সে ধমক দিয়ে উঠে জবাব দিলে, আরে গেল যা! খাওয়ার নামে কাছা-কোঁচা একেবারে বে-সামাল হয়ে গেল যে তোর! এমন করে লাফিয়ে উঠেছিস যে, আর একটু হলেই নৌকো কাৎ হয়ে উল্টে যেতো!

চট্‌পটি মধ্যস্থ হয়ে কইলে, যাক্ ওকে দোষ দিসনে ভাই! দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাই এমন রসালো যে, ওটার কথা মনে হলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল একেবারে একাকার হয়ে যায়। ঘণ্টে জলে ছিল কি ডাঙ্গায় ছিল, সেইটে তার আদপেই খেয়াল ছিল না। চটপটির কথা বলবার ধরণ দেখে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। সেই হাসির শব্দে নদীর তীরে বসা একদল চখা ডানা ঝটপট উড়ে চলে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা।

ছেলের দল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দাওয়ায় সবাই গিয়ে জুটেছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু পিদিম জ্বালিয়ে একটা মোটা ইংরেজী বই পড়ছিলেন।

ঘণ্টে কথা জুগিয়ে দেয়—সেই রথের মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হবার ব্যাপার নিয়ে।

ফটিক চোখ টিপে বল্লে, বেশীদিন ঋণটি অনাদায়ী পড়ে থাকলে তামাদিও ত' হয়ে যেতে পারে—

এইবার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মনের আনন্দে এক সঙ্গে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে ওঠেন।—তা বেশ ত! তোমরা ত ঘরের ছেলে, আমার এখানে ডাল-ভাত কবে খাবে বলো—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। জ্যাঠাইমা মায়ের আদরে প্রশ্ন করেন ছেলেদের।

ফটিক মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বলে, উঁহু ডাল-ভাত নয়—ভোজ।

ঘণ্টে বল্লে, তাও এখানে নয়—

—তবে? জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। চটপটি বলে, আমরা জায়গা দেখে এসেছি। নদীর মধ্যে যে দ্বীপ,—সেইখানে হবে আমাদের বন-ভোজন।

টোনা বল্লে, তোরা কিন্তু আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিস সবাই—

ছায়েদ এইবার উৎসাহিত হয়ে জবাব দিলে, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমাকে সেখানে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করতে হবে—খিচুড়ী, মাংস, পরমান্ন, চাটনী···

ষষ্ঠী মাথা উঁচু করে কইলে, খুব সক্কাল বেলা আমরা তিনখানা ছৈ-ওয়ালা নৌকো নিয়ে রওনা হয়ে যাবো। সারাদিন থাকবো সেই বট গাছের তলায়। নদীতে স্নান-রান্না-গল্প-গান-খাওয়া-দাওয়া—

—তারপর সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসবো গাঁয়ে, কথাটা শেষ করলে মাকুন্দো।

জ্যাঠাইমা দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরে বল্লেন, আমার কানের পোকা বেরিয়ে গেল, তোরা বাপু গান থামা দিকি—

—তবে কি আপনার উনুন নিভে গেছে আমাদের গানে ?

—জল তুলে আনবো জ্যাঠাইমা ?

—আমি কুট্‌নো কুটে আপনাকে সাহায্য করি ?

—মাছের মুড়োটা দা' দিয়ে আমি গুড়িয়ে দিচ্ছি—

—মাংসে কি হলুদ-লঙ্কা মাখাবো ?

—লাউটা নদী থেকে ধুয়ে আনবো ? নানাদিক থেকে প্রশ্নের বানে জ্যাঠাইমা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তিনি দু'হাত তুলে বল্লেন, ওরে বাবা, তোরা থাম দিকি ! সবাই খুব কাজের ছেলে বেশ বুঝতে পেরেছি। তোমাদের বাছা কিছু করতে হবে না—শুধু আমি কি করি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্—

মৃত্যুঞ্জয়বাবু এতক্ষণ বড় বট গাছটার ছায়ায় বসে সেই মোটা ইংরেজী বইটা এক মনে পড়ে যাচ্ছিলেন, এইবার হাতের আঙ্গুলের মধ্যে নিশানা ঠিক রেখে বল্লেন শোনো তবে বলি, তোমাদের জ্যাঠাইমার এরকম ব্যাপার অনেক অভ্যেস আছে। তারপর চোখ বুঁজে সময়টা ঠিক করবার চেষ্টা করতে করতে বল্লেন,—প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। একদিন গভীর রাত্রে দলবল নিয়ে এসে হাজির হলাম বাসায়। সবাইকার পেটে তখন খিদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ইট-কাঠ যা পড়বে একেবারে মুহূর্ত্তে ভস্ম হয়ে যাবে। বল্লাম, বারোজনের রান্না করতে হবে এক ঘণ্টার মধ্যে,—তা তোমাদের জ্যাঠাইমা পেছপা ছিলেন না।

এক কাজ কর। খিচুড়ির ডেক্‌চিটা খুন্তি দিয়ে বারে বারে নেড়ে দে, নইলে তলায় ধরে যেতে পারে। আমি মাংসটা ততক্ষণে দই, পেঁয়াজ আদা দিয়ে মেখে ফেলি। ফটিক একটা কাজের মতো কাজ পেয়ে মালকোঁচা মেরে বল্লে, হ্যাঁ এইবার আমি সত্যি একটা কেরামতি দেখাতে পারবো। খুন্তিটা দিন দেখি আমার হাতে।

ফটিক খুন্তি নাড়তে লাগলো আর জ্যাঠাইমা চলে গেলেন মাংস মাখতে। খুন্তি নাড়তে নাড়তে ফটিক যে কখন রতনের সঙ্গে সাঁতারের প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে তা' নিজেই ঠাহর করতে পারেনি। আলোচনা যত বেশী জোরালো হ'য়ে উঠেছে খুন্তি নাড়ার কাজ তত বেশী মন্থর হয়ে গেছে! হঠাৎ ওদের দুজনের আলোচনা ধমক দিয়ে থামিয়ে মাঝখানে রণচণ্ডী বেশে এসে হাজির হলেন জ্যাঠাইমা।

চীৎকার করে বল্লেন, যা ভেবেছি তাই! আরে বাপু, ছাগল দিয়ে কি আর ক্ষেত চাষ হয়?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চশমা কপালে তুলে ভয় পেয়ে শুধোলেন, কি হলো আবার?

জ্যাঠাইমা কপালে করাঘাত করে জবাব দিলেন, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু!—খিচুড়িটা ধরিয়ে ফেলেছে। আরে বাবা, খিচুড়ি নাড়তে নাড়তে অত বেশী সাঁতার কাটলে চলে!

জ্যাঠাইমার কথা বলার ধরণ দেখে সবাই নতুন মজা পেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু ফটিক বেচারীর মুখ একেবারে চূণ!

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বল্লেন, খিচুড়ীটা তলায় একটু ধরলে বেশ একটা গন্ধ হয়—চমৎকার স্বাদ লাগে জিবে···কি বলো তোমরা?

ফটিকের দশা দেখে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, ঠিক! ঠিক!

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবু মিথ্যে বলেন নি। তলায় সামান্য একটু ধরেছিল বটে, খাওয়ার সময় খিচুড়িটা লাগল ভালো। জ্যাঠাইমা ভয়ে ভয়ে বেশ কিছু লঙ্কা ঘুটে দিয়েছিলেন।

ছেলেদের যত চোখের জল পড়ে—বলে, জ্যাঠাইমা, আর একটু দাও ত', ফটিকের খিচুড়ি-পোড়া বড্ড ভালো হয়েছে!

খাওয়া হয়ে গেলে ছেলের দল হাতে হাতে সমস্ত বাসন-কোসন নদীর ধারে বসে মেজে ফেল্লে। তারপর রওনা হবার পালা। তিন-খানি নৌকো এক সঙ্গে রওনা হল।

ঝির-ঝির করে গাঙের হাওয়া বইছে···আকাশে উঠেছে চাঁদ। নাম-না-জানা পাখী ডেকে চলেছে নদীর এপার থেকে ওপারে। ছেলেদের কণ্ঠে জেগে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গান।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চোখ বুঁজে বল্লেন, এর চাইতে বড় স্বর্গ আর আমি কামনা করি না।

সাত

ছেলেরা যাচ্ছিল দল বেঁধে বিলে সাঁতার দিতে, বিশু খুড়ো তাদের ডেকে বল্লেন, ওরে, আমি যে তোদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ছেলের দল থম্‌কে দাঁড়ালো, বল্লে, কেন বিশু খুড়ো? নেমন্তন্ন করবেন বুঝি? বিশু খুড়ো লাঠি ঠুকে বল্লেন, নেমন্তন্ন ত' নিশ্চয়ই—তবে আমার বাড়ি নয়—কালীবাড়ি। চাঁদা তুলতে হবে—তা হলেই ছাঁদা বাঁধতে পারবি।

দেব না। বরাবরের যে দু'আনা তা' যদি তোমরা নাও এক্ষুনি বের করে দিচ্ছি—। মুস্কিল আসানের আশায় গণেশবাবু ওদের মুখের দিকে তাকান।

কিন্তু ওখানে একেবারে মরুভূমি, কোনো মরুদ্যানের সন্ধান সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফটিক বল্লে, দেখুন আমাদের কাছে চাঁদা দিতে হলে ওই পুরো আট আনাই দিতে হবে। আর দু আনা দিয়ে যদি কাজ সারতে চান তবে বিশু খুড়োর কাছে দেবেন। ষষ্ঠী বল্লে, এবার আবার বলির পাঁঠার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হঠাৎ যেন গণেশবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হ'ল।

—বলির সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে? বিশু খুড়ো সায় দিয়েছে?

—হ্যাঁ, খুড়ো নিজেই ত' আমাদের বল্লেন।

—আচ্ছা বাবা—তবে আট আনাই নিয়ে যাও, কিন্তু একটা কথা। পাঁঠা যখন কিন্‌তে যাবে হাটে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও, দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠা মায়ের স্থানে বলি দিতে হবে।

ভক্তিতে গণেশবাবু গদগদ হয়ে ওঠেন যেন। আনন্দের আতিশয্যে ট্যাঁক থেকে একটি চক্‌চকে আস্তো আধুলি বের করে ছেলেদের হাতে দিয়ে এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন প্রকাণ্ড একটা রাজ্যিই তিনি ঝোঁকের মাথায় দান করে ফেল্লেন!

জনার্দন সরকারকে ছেলেরা পাকড়াও করলে হাটে যাবার পথে। ভুরু কুঁচকে সরকার মশাই প্রশ্ন করলেন, চাঁদা? কিসের চাঁদা?— যেন তিনি এ অঞ্চলেরই লোক নন্।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দেখলে, বসির মিঞা হাট করে ফিরে আস্‌ছে ; ছেলেরা ছুটে গিয়ে ওকে ঘিরে দাঁড়ালো।

বসির মিঞা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে শুধোলে, কি লাঠিয়াল ভাইরা, কি মতলব ?

আমাদের কালী পূজোর চাঁদা দিতে হবে ওস্তাদজী—

বসির মিঞা একগাল হেসে জবাব দিলে, আমি গরীব মানুষ, যদি তোমরা নাও ত' একটা সিকি দিতে পারি—

ফটিক বল্লে, আচ্ছা বেশ, তাই দাও।

বসির মিঞা ওদের হাতে একটা সিকি দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

রতন বল্লে, দেখ ত আমাদের ওস্তাদজীর নামে কত চাঁদা ধরা আছে ?

ফর্দ খুঁজে কিন্তু বসির মিঞার নাম পাওয়া গেল না। ছেলেরা নাম বসিয়ে দিলে। এমনি করে চাঁদা উঠল নেহাৎ মন্দ নয়।

এই বাৎসরিক কালী পূজো উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর কালী বাড়ির সামনের খোলা মাঠে একটা করে মেলা বসে। বাঁশ পুঁতে ছোটো-বড়ো ঘর এখন থেকেই তৈরী হচ্ছে। কোথায়ও পুতুল নাচ হবে ; কোথাও বসবে কদমা-ফেণী বাতাসার দোকান ; কোথায়ও ছুরি কাঁচি, জাঁতি ইত্যাদির দোকান ; কাপড়ের দোকান, চিনির সাজের দোকান, মাটির পুতুলের দোকান, কাঠের খেলনার দোকান, খাবারের দোকান—কিছুই বাদ যাবে না।

কোথায় কিসের দোকান গত বছর বসেছিল তাই নিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে আলোচনা তর্ক আর বাজি রাখা চলছে।

কার খেতের ফসল কত ভালো হয় তারি একটা প্রতিযোগিতাও

করে উঠলো। বিশু খুড়ো মনে মনে ভাবলে এই জয়ধ্বনি তারই প্রাপ্য।

দ্বিতীয় অঙ্কে পুতনা রাক্ষসী বধ হবার পর যাত্রা খুব জমে উঠল। দর্শকদল ঘন-ঘন করতালি দিয়ে অভিনেতাদের উৎসাহ দিতে লাগলো। বেহালা বাদক মাথা নেড়ে, টিকি দুলিয়ে ছড়ে টান দিলে।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

যাত্রা শোনবার জন্যে নানা গ্রাম থেকে বহু লোকজন জমা হয়েছিল। কালী বাড়ি প্রাঙ্গনে তাদের স্থান হওয়া একেবারে অসম্ভব। তারই মধ্যে একটি দুষ্টু ছেলে টিকেতে আগুন ধরিয়ে বাইরে থেকে ছুঁড়ে একেবারে সামিয়ানার ওপর ফেলে দিয়েছে। আর যাবি কোথায়! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে পালা-পালা রব। গ্রামের ষণ্ডা-ষণ্ডা ছেলেরা এসে চারদিক থেকে সামিয়ানার দড়ি কেটে ফেলে কোন রকমে আগুন নিভিয়ে ফেল্লে। নইলে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেত। কিন্তু যাত্রা ওই পর্য্যন্তই শেষ! যাত্রাদলের লোকেরা সেই রাত্রিতেই গরু গাড়ীতে মাল চাপিয়ে একেবারে পলায়ন!

বিশু খুড়ো মাথা চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে বল্লে, এমন সুন্দর "কংশ বধ" পালা ঠিক করলাম, তা কোন্ চ্যাংড়া ছোঁড়া একেবারে খাণ্ডব-দাহন করে ছাড়লে!

পরদিন রাত্রে কালীবাড়ি পূজো···তারপর ভোগের ব্যবস্থা··· গ্রামস্থ লোকের নেমন্তন্ন। পল্লী অঞ্চলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের খাওয়া আলো জ্বালিয়ে হয়—, আর রাত্রিরের খাওয়া যে কখন হয় সেটা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না!

মাথায় করে মাটি কাটার ব্যাপার! চট্ করে যেন রাজী হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন; আরে তোরা এত ভাবছিস কি? এতে ভাবনার আছেই বা কি? প্রথম ঝুড়ি মাটি আমিই মাথায় ক'রে বয়ে নিয়ে যাবো।

এর পর আর কোন মতেই আপত্তি করা চলে না। অনেকের বাড়ীতেই কোদাল আছে; তাই সেটা সংগ্রহ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না।

প্রশ্ন ওঠে ঝুড়ি নিয়ে। চটপটি বলে, আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে গোটাকয়েক ঝুড়ি আছে সেগুলো আমি বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবো'খন। এই ভাবে একটা দুটো করে ঝুড়িও জুটে যায় মেলা।

সত্যিকারের আন্তরিক ইচ্ছা যদি থাকে, তবে উপায় একটা হয়ই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর যে কথা সেই কাজ। প্রথম ঝুড়ি মাটি তিনি মাথায় করে নিয়ে কালীবাড়িতে ফেল্লেন। জয়ধ্বনি করে উঠল সবাই!

প্রবল উৎসাহে ছেলেরা কাজ সুরু করে দিলে।

কয়েক দিনের মধ্যেই অদ্ভুত কাজ দেখা গেল।

পয়সা দিয়ে মজুর খাটাল যা না হত—ছেলেদের কর্মকুশলতায় তার দ্বিগুণ কাজ হল এক সপ্তাহের ভেতরে। প্রথমে বুড়োরা বাঁকা চোখে নানা রকম মন্তব্য করেছিল।

—হ্যাঁ, কামার মানুসের কুমোরের কাজ!

—যত তারা ছিল বুনে, সব হল কীর্ত্তুনে!

—লেখাপড়া চুলোয় গেল, এখন মাটি কেটে মর!

দু একটী ছেলে অভিভাবকদের কাছে প্রহারও যে না খেল সে কথা কোনোমতেই জোর করে বলা চলে না।

তবু কাজ এগিয়ে যায় অতি সুন্দর ভাবে।

একদিন কিন্তু ওই মাটি কাটা নিয়েই গোলমাল বেঁধে গেল; যে জায়গাটা থেকে মাটি কাটা হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে গাঁয়ের দশ সরিকের জমি। হঠাৎ এক সরিকের কি কুবুদ্ধি হল—সে এগিয়ে এসে বল্লে, আমি আমার জমি থেকে কিছুতেই মাটি কাটতে দেব না।

ছেলেরা অতশত বোঝে না,—তারা খবর পাঠালো মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে। তিনি সংবাদ পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলেন। বল্লেন, তোমার ত বাপু এক পয়সার অংশ এখানে, সে এক পয়সা আমরা স্পর্শও করবো না। তবু লোকটি নাছোড়বান্দা! আসল কথা হচ্ছে এই যে, তার ছেলেও এই মাটি কাটার দলে ছিল। কিন্তু সেটা সে আদপেই বরদাস্ত করতে পারছে না। নানাভাবে ঝগড়া বাঁধাতে চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎ তার ছেলে একদিন গোপনে এসে খবর দিল যে, তার দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো ভিন গাঁয়ের তেজারতি কারবারী এক মহাজন; লোককে টাকা ধার দিয়ে আর সুদ নিয়ে প্রচুর অর্থ জমিয়েছে। এই বিয়ের জন্য মেয়ের বাপকে অনেক টাকা দেবে। ভাইয়ের নাম টোনা। সে-ই সব খবর মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে দিয়ে বল্লে, দিদি রাত দিন কাঁদছে, আপনি ওকে বাঁচান।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, এইবার মাটি না কাটতে দেবার শোধ নিতে হবে; দাঁড়াও না, আমি কি করি দেখ! ছেলেদের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়বাবু গোপনে কি পরামর্শ করলেন কাক পক্ষীতেও জানতে পারল না।

ছেলেরা বুড়ো মহাজনকে বল্লে, আপনার কিন্তু ছুটি নেই। বিয়ে হয়ে গেলে বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে হবে, তারপর আমাদের সঙ্গে বসে গরম গরম লুচি খেতে হবে। চটপটি গেছে রসগোল্লার সন্ধানে। সে না জোগাড় করে ফিরবে না, সেটা আমরা জানি। আপনাকে মিষ্টি মুখ করে যেতেই হবে।

এর পর কালীবাড়ীর ভিটে বাঁধানোর কাজ শুধু যে নির্বিঘ্নে সমাধা হল তাই নয়, ছেলেরা জোগাড় যন্ত্র করে একটা ফুলের বাগানও তৈরী করে দিলে, তারপর বেড়া বেঁধে দিলে নিজেদের হাতে।

একদিন মৃত্যুঞ্জয়বাবু হেসে বল্লেন, এইবার তোদের ডাক পড়েছে রে—

ফটিক শুধোলে, কোথায় ?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চশমাটা কপালের ওপর তুলে মাথা নাড়তে নাড়তে বল্লেন, এটা কি মাস আগে বল—?

ছেলেরা বল্লে, ভাদ্র মাস—

মৃত্যুঞ্জয় বল্লেন, তবে ?

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, জবাব, খুঁজে পায়না। মৃত্যুঞ্জয়-বাবু উত্তর করলেন, ওরে হাঁদারামের দল,—ভাদ্রমাসে তাল পাকে এটাও জানিস নে তোরা ? আমার গাছ ভর্ত্তি পাকা তাল। তোদের জ্যাঠাইমা তালের বড়া আর ক্ষীর তৈরী করে বসে আছে।

তখন ছেলের দলের হুল্লোড়ে কান পাতে কার সাধ্য !

নয়

চটপটির বাবা এখন গ্রামের মধ্যে সব চাইতে ব্যস্ত-বাগীশ লোক। শুধু চটপটিরাই নয়, গ্রামের মধ্যে যে ক'ঘর কুমোর আছে তারা সবাই। এ গ্রামের চল্‌তি নিয়ম এই যে, প্রতি বাড়িতেই দুর্গোৎসব হয়।

কাজেই প্রতিমাও তৈরী হয় সব বাড়িতে।

প্রথমে হয় কাঠামো তৈরী, তারপর খড়ের মূর্তি তৈরী—ওরা বলে জরা বাঁধা ; তারপর এক মেটে, দু' মেটে, তিন মেটে। কোন্ বাড়ির সিংহ কি ভঙ্গিতে কেশর ফুলিয়ে অসুরকে আক্রমণ করবে আর কোন্ বাড়ির অসুর কি ধরণের বীরত্ব দেখাবে—সেই নিয়ে ছেলে মহলে আর আলোচনা-গবেষণার অবধি থাকে না।

ছোট খাটো খণ্ড যুদ্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যায় এই নিয়ে। মা দুর্গা অসুরের কাঁধে ত্রিশূলের খোঁচা দেবেন—না, সোজাসুজি ত্রিশূলটা বুকে বসিয়ে দেবেন, তাই জানবার জন্যে ছোটরা প্রশ্ন করে কুমোরদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে !

ওদিকে মালাকারের দল নানা রকম শোলা আর রাংতার গয়না তৈরী করার কাজে উঠে পড়ে লাগে।

পাশের গাঁয়ে তৈরী হয় নানা রঙের শাড়ী আর নানা জমিনের ধুতি। পূজোর চাহিদা মেটাতে তারা হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়। তাঁতের ঠক্-ঠকা-ঠক্ শব্দ চলেছে সে অঞ্চলে।

এই গ্রামে পাঁঠা বলি দেবার ভারী ঘটা। পূজোর এক মাস আগে থেকে প্রত্যেক বাড়ির ছেলেরা নিজেদের রক্ষণা-বেক্ষনে পাঁঠা-

গুলিকে ঘাস খাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোন্‌টা কার পাঁঠা সেটাও চিহ্নিত হয়ে থাকে। কালা-ধলায় মেশানো পাঁঠাটা বরুণের, কুচ্‌কুচে কালোটা হরিশের, সাদা পাঁঠা গণেশের। এই পাঁঠাগুলির নামকরণ পর্য্যন্ত হয়ে যায়। ব্যাঁ-ব্যাঁ, শিংয়ের গুতো, লম্বকর্ণ, মুক্তো দাঁতি··· এমনি কত নাম! এই নামকরণের ব্যাপারে বড়রাও ছোটদের সাহায্য করে থাকে। এই সব পাঁঠার কোনোটিকে যদি শেয়ালে কামড়ে ধরে কিম্বা ঠ্যাং খোঁড়া করে দেয়, তবে আর সেটা পূজোয় লাগবে না। পাঁঠার ক্ষুদে মালিকের সেজন্য ভারী আনন্দ, কেননা সে বলির হাত থেকে বেঁচে গেল! আবার যেদিন যে পাঁঠা বলি হয়, সেদিন তার মালিক বলি দেখে না, মাংসও ছোঁয় না···সারাদিন মন-মরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এই নিয়ম চলে আসছে চিরকাল।

গ্রামের খালটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে রোজই ভীড় জমতে থাকে। ষ্টীমার ঘাট থেকে যারা আসে—এইখানেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে।

—আজ দক্ষিণ বাড়ির দু'জন এসেছে—

—আজ সেনদের বাড়ির বাবুরা এলো।—

—আজ নয়া বাড়ির ঠাকুরুণরা এলেন।

যাদের বাড়ির লোকজন আসে তারা আনন্দে ডগমগ হয়ে লাফাতে থাকে। যাদের আসে না তারা ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফেরে। পরদিন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে খাল ধারে গিয়ে হাজির হয়। এমনি করে সারাটা গ্রাম ভর্ত্তি হয়ে ওঠে।

করা যায় না। আবাল-বৃদ্ধবনিতার প্রণাম আর আশীর্বাদ গ্রহণের সেই দৃশ্য না দেখ্‌লে সত্যিই বুঝতে পারা যায় না! ছেলের দল সঙ্গে থলি নিয়ে বেরোয়। যে সব সন্দেশ আর নাড়ু খেয়ে উঠতে পারে না, তা জমা হয় ঐ থলির ভেতর। তারপর অন্য সময় ওই খাবার দিয়ে আসর জমে ভালো!

সেবার ফটিক আর রতনের দল দু থলি খাবার সংগ্রহ করে সন্ধ্যে বেলা আর একটা মজার আসর বসালে নিজেদের মধ্যে।

সেন বাড়ীর সর্বেশ্বর সেন প্রতি বছর পূজোর ছুটিতে গ্রামের কুমার-কুমারী ভোজন করান; এই প্রথাটা বহুকাল থেকে চলে আসছে। শুধু তাই নয়—খাওয়ার পর সবাইকে আট আনা করে ভোজন দক্ষিণা দেয়া হয়। কাজেই এই দিনটির দিকে গ্রামের ছেলে মেয়েদের একটা লোভাতুর দৃষ্টি থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক।

এবার কুমার-কুমারী ভোজনে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল সব চাইতে বেশী। গ্রামে সেন মশায়ের কৃপন বলে একটা বদনাম আছে। কিন্তু কুমার-কুমারীদের খাওয়ানোর ব্যাপারে অতি বড় শত্রুতেও তার ত্রুটি ধরতে পারবে না। এমন সুন্দর আর এমন নিখুঁত আয়োজন! ছেলে-মেয়েরা মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তাই তিনি মেঠাইয়ের আয়োজন করেছেন সব চাইতে বেশী। যে যত খেতে পারে।

কোজাগরী পূর্ণিমায় গ্রামের দৃশ্য ভোলবার নয়। জ্যোৎস্নার জোয়ার লেগেছে সারা গ্রামখানিতে।

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন রূপোলী গুঁড়ো ঝরে পড়ছে—গাছের ওপর, খালের ধারে ধারে, চল্‌তি মানুষের মাথায় মাথায় আর শাপলা ফুলের আশে পাশে।

বসির মিঞা জবাব দেয়, আর দেরী নেই কর্তা, এসে গিয়েছে দিন। এইবার আপনাদের প্রাণভরে লাঠি খেলা দেখাবো। গত সন গতর ভালো ছিল না বলে কিছু করতে পারিনি।

—বেশ—! বেশ! বাড়ির ছেলে-পেলেরা, বৌ-ঝিরা আগ্রহ করে আছে, কবে তোমাদের লাঠি খেলা দেখবে।

—সেত' ঠিক কথাই কর্তা। আপনাদের হিন্দু পাড়া থেকে ইনাম মিলবে, বকশিস মিলবে, নতুন ধুতি পাবো—খেলা দেখিয়ে ত' ওখানেই সুখ।

তারপর সত্যিই কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল,—বেরুল রঙ-বেরঙের তাজিয়া···

মুসলমান চাষিদের দল মাথায় গামছা বেঁধে নিলে।—

সুরু হল লাঠি খেলার কসরৎ দেখানো···আজ এপাড়া, কাল ও পাড়া।

—ও মিঞা-ভাইরা, আমাদের বাড়ি এসো ;—গাছের লাউ দেব, ক্ষেতের ধান দেবো···আর দেব নয়া গামছা।

—বেশ চলো, মা-ঠাকরুণকে বলে এক জোড়া নয়া ধুতি দিতে হবে কিন্তু।

খেলা জমে ওঠে এক একদিন এক এক প্রাঙ্গণে।

দর্শকবৃন্দ কিন্তু বেশীর ভাগই হিন্দু, কিন্তু তাতে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। আপনার গাঁয়ে আপনার উৎসব—মন মত না হলে ত' নিজেদেরই বদনাম!

এরই মধ্যে আবার এসে পড়ে দীপান্বিতা। কিন্তু গাঁয়ের

এর মধ্যে আর এক কাণ্ড !

দুপুর রাত্তিরে ছেলেদের চীৎকারে গোটা গাঁয়ের লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চটপটি নাকি ষষ্ঠীর সঙ্গে বাজি রেখে এই অমাবস্যার রাত্তিরে শ্মশানে গেছে একা। বহুক্ষণ কেটে গেছে, তার আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ছেলের দল মশাল জ্বালিয়ে রওনা হল তার সন্ধানে। সঙ্গে গেল বসির মিঞা।

যা ভয় করা গিয়েছিল তাই।

একটা লতার সঙ্গে পা জড়িয়ে চটপটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে শ্মশানের খালের ধারে। চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপ্টা দিতে তবে তার জ্ঞান ফিরে আসে।

চেতনা পেয়েই সে চীৎকার করে উঠল, ওরে কে আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে, তোর পা জড়িয়ে ধরেছে এই বুনো লতা।

ষষ্ঠী মুখ কাচু-মাচু করে বল্লে, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে !

—চল, কালী পূজোর পর গরম গরম মহাপ্রসাদ রান্না হয়েছে, তাই খেয়ে মনে বল কর্‌বি চল—।

ছেলেরা বল্লে, কিন্তু তার আগে গুড় জল খাইয়ে দিস ওকে। এই সাহস নিয়ে অমাবস্যার রাত্তিরে তুই শ্মশানে আসিস একা ?

এই ঘটনার দুদিন পরের কথা।

ভাই ফোঁটার দিন ফটিকের দুই বোন—উষা আর সন্ধ্যা ভায়েদের ফোঁটা দিচ্ছে; এমন সময় বাইরে থেকে ছায়েদ হাঁক দিলে, ফটিক

সারাটা দেহ থর্‌-থর্‌ করে কাঁপতে থাকে। চোখ লাল হয়ে ওঠে। কি সব আবোল-তাবোল কথা মনে জাগে···

ছায়া ছবির মতো ভেসে বেড়ায় অসংলগ্ন ঘটনায় টুক্‌রোগুলি! চোখ মেলে তাকালেই দেয়ালের টিক্‌টিকিটা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। কখনো এগিয়ে আসে···কখনো খুব পেছিয়ে যায়!

কবে মাছ ধরবার সময় পায়ে কাঁটা ফুটেছিল······

মনে হয় সেই মাছের মুড়োটা রাক্ষসের মুখের মতো বড় হয়ে হাঁ করে তাকে গিলে খেতে আস্‌ছে।

এম্‌নি ধাঁই-পাঁই মালোয়ারী জ্বর হয়েছে চট্‌পটির। চট্‌পটির কেবলি মনে হচ্ছে যে, খাল-বিল-নদী-নালায় যত জল আছে সব এক চুমুকে সাবাড় করে দিতে পারে।

হঠাৎ চট্‌পটি চীৎকার করে উঠ্‌ল, আমি কাঁচা তেঁতুল দিয়ে পান্তা-ভাত খাবো।

ওর বাবা বল্লে, খাবি বৈকি! ওই ত' মালেয়ারীর অযুধ। জ্বরটা একটু নরম হোক···দু'দিন যাক্‌···খাস্‌ এখন।

রতন এসেছিল তার মায়ের জন্যে একটা কুঁজো কিন্‌তে। এসে দেখে, চট্‌পটির দরুণ জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখে গা পুড়ে যাচ্ছে।

সে চট্‌পটির বাপকে বল্লে, এ তোমরা কি করেছ কুমোর খুড়ো? দারুণ জ্বর উঠেছে যে ওর। ১০৬° এর কম নয়। এক্ষুনি যে মাথায় রক্ত উঠে যাবে—

তামাক টান্‌তে টান্‌তে চট্‌পটির বাবা জবাব দিলে, না দাদাবাবু, ও কিছু নয়। মালোয়ারী জ্বর অমনিই ধাঁই-পাঁই করে ওঠে···আবার

এসে হাজির হলেন, তারপর কুয়ো থেকে সবাই মিলে ঘড়া ঘড়া জল তুলে ওর মাথায় ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। আধ ঘণ্টা ধরে এই ভাবে মাথায় জল ঢাল্‌বার পর জ্বরটা নরম হল আর সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সেই অস্থির ভাবটাও কেটে গেল।

কয়েকটা দিন ধরে এইভাবে জ্বরটা ওঠ-নামা করতে লাগ্‌লো।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর একদিন বিকেল বেলা বেড়াতে এসে মাথা নেড়ে বল্লেন, উঁহু! এ ভাবে চটপটির জ্বর কমবে না। আমি আস্‌বার সময় তাকিয়ে দেখ্‌লাম,—চারদিকে বিস্তর ঝোপ-জঙ্গল। রোজ রোগীকে মশায় কাম্‌ড়াচ্ছে। ওকে মশারীর ভেতর রাখতে হবে।

কুমোর খুড়ো ঠিক আগের মতোই তামাক টান্‌তে টান্‌তে জবাব দিলে, তোমাদের যেমন কথা দাদাবাবু! আমাদের আবার মশারি, আবার খাট-পালঙ্ক ··তোষাক···পাশ-বালিশ! বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমল থেকে যে ভাবে চল্‌ছে সেই ভাবেই চল্‌বে। ধূম ধাড়াক্কা করে জ্বরও আস্‌বে, আবার পান্তা দিয়ে তেঁতুল গোলা খেলে পালাতে পথ পাবে না! ওর জন্যে তোমরা এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বুঝ্‌তে পারছি নে!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আবার মাথা নেড়ে বল্লেন, উঁহুঁ! বাপ্‌-ঠাকুর্দ্দার আমল চলে গেছে। তারা যা খেতে পেতো আর খেয়ে হজম করত আজকালের দিনের ছেলেরা কি তাই খেতে পায়? এ জ্বরের সঙ্গে বুঝ্‌বে কি করে? কাজেই জ্বর থেকে একেবারে শক্ত ব্যামো টায়ফয়েড্‌ ধরে যায়। পেটটা যাতে রোগীর ভালো থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে দিতে হবে। আর মশারি একটা অবশ্য জোগাড় করতে হবে।

আর কুইনিনের সাহায্যে তখন চট্‌পটির জ্বর তাকে ছেড়ে পালাতে পথ পেলো না।

কুমোর খুড়ো বল্লে. জ্বর নেমে গেছে—এইবার যা'—কলের জলে একটা ডুব দিয়ে বেশ করে পান্তা কচ্‌লে খেয়ে নে - শরীর একেবারে ঝর্‌ ঝরে হয়ে যাবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, সর্ব্বনাশ! আমরা যখন আছি, তখন ও পুরোনো ব্যবস্থা কোনো মতেই চল্‌বে না। প্রথম দিন কৈ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে হবে।

যষ্ঠি আর মাকুন্দো বল্লে, আমরা কৈ মাছ মেরে নিয়ে আস্‌বো বঁড়শী দিয়ে,—সেজন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না।

চট্‌পটি বল্লে, আমার মনে হচ্ছে—গাঁয়ে যত চাল আছে তার ভাত রান্না হলে—আমি সবটা একাই খেয়ে ফেল্‌বো।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু হেসে বল্লেন, জ্বরের পর অমনি খাই-খাই ভাবই হয়। মুখে যদি অরুচি না হয়ে থাকে তাকে শুভ লক্ষণ বল্‌তে হবে। পল্‌তা পাতার ঝোল খেতে হবে ওকে।

পলতা পাতা গাঁয়ে আছে প্রচুর। তুলে আন্‌লেই হবে। ঘণ্টে বল্লে, আমি এনে দেবো পল্‌তা পাতা, কত চাই?

এই ভাবে ছেলেদের কড়া ব্যবস্থায় চট্‌পটি ভালো হয়ে উঠ্‌ল।

রোগী যখন একেবারে সুস্থ হয়ে আগেকার মতো আবার ছেলেদের দলে ভীড়ে গেল তখন হঠাৎ গাঁয়ের বিশ্বম্ভর ডাক্তার একদিন কুমোর-বাড়ী এসে হাজির।

একথা, সে কথা, মোড়ায় বসে আলাদা হুঁকোয় অনেকক্ষণ ধরে তামাক টানার পর বিশ্বম্ভর ডাক্তার বল্লেন, তা বাবা, তোমাদের আর

যার যার উঠোন পরিষ্কার করে গেরস্তরা।

মা লক্ষী ঘরে আস্‌ছেন পায়ে হেঁটে।

গোবর জলের ছড়া দিতে হবে, উঠোন ভালো করে নিকুতে হবে —যেন সিঁন্দূরটুকু পড়লে হাত দিয়ে তুলে নেয়া চলে।

আর দিতে হবে চিত্র-বিচিত্র লক্ষীর আলাপনা!

তুলসী তলার পিদিম নতুন আশ্বাস নিয়ে আসে গাঁয়ে।

ওদিকে ধান কাটা সুরু হয়ে গেছে মাঠে-মাঠে। পাকা ধানের গন্ধে সারাটা গ্রাম একেবারে ম' ম' করছে।

সোনা ধানের ওপর পড়েছে সোনালী রোদ।

তাই ত কৃষাণদের কণ্ঠে জেগে উঠেছে গান।

ওদের গানের গলা কিন্তু বেশ!

দল বেঁধে এক সঙ্গে কাঁচি চালায় হাতে—আর গান গায় গলা ছেড়ে। সেই গানের কথা আর সুর সারা মাঠময় পাগ্‌লা হাওয়ার কাঁধে চেপে ভেসে বেড়ায়।

যে সব পথিক পাশের জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে পথ চলাচল করে তারাও বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে এ গাঁয়ের কিষাণদের গান নীরব দুপুরে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে যায়।

ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে লোকের মাথায় মাথায় সেই সব ধান এসে গেরস্ত বাড়ীর উঠোনগুলি ভর্ত্তী করে ফেলে।

তারপর কিছুদিন চল্লো ধান আর খড় আলাদা করবার পালা।

ঢেঁকীতে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা ধান ভানে, তার শব্দ এ পাড়া থেকে ও

পাড়া অবধি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী ভরে যায়।

নবান্নের উৎসবে সারা গাঁয়ের লোক মেতে ওঠে। মিঠে লাল চালের গন্ধে—অন্ধ আতুর ভিখিরীর দল এসে ভীড় জমায়।

তাদের কিন্তু ফেরাতে নেই, মা লক্ষী তা হলে মুখ ফিরিয়ে নেন; বাড়ীর ছেলে মেয়েরাই তাদের আঁচল ভরে চাল তুলে দেয়।

এগারো

এইবার গাঁয়ের বুড়ী দিদিমা-ঠাকুর মার দল দাঁতে মিশি মাখ্‌তে মাখ্‌তে বল্লে, বৌ-ঝিরা, কাঁথা, দোলাই, লেপ-তোষক রদ্দুরে দাও। শীত এসে গেছে।

প্রত্যেক বাড়ীর উঠোন জোড়া বাঁশ খাটানো হয়েছে। সেখানে সারে সারে রদ্দুরে দেয়া হয়েছে—পুরোনো আমলের পদ্ম-কাঁথা, দোলাই, কাশ্মিরী শাল, কম্বল, লেপ, তোষক, ঠাকুর্দ্দার আমলের সব গরম জামা।

সত্যি শীত এসে গেছে

সকালের সোনালী রদ্দুরটুকু ভারী মিঠে লাগে।

বুড়োর দল কাপড়ের খুঁট গাঁয়ে দিয়ে দাঁতন করতে করতে গাঁয়ের চোরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়। কার কটা খেজুর গাছ আছে সেই সম্পর্কে আলোচনা চলে। খেজুর গাছের তলাগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে। কাম্‌লা ডেকে হাঁড়ি বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে।—খেজুরের রসের দিন এসে গেল যে!

সেন বাড়ীর বুড়ো সর্ব্বেশ্বর সেন বল্লেন, শীতের দিনেই ত' খাওয়া দেওয়ার সুখ। পিঠে খাও, পায়েস খাও, সর-পড়া বেগুন্ খাও, চিতল

মাছের ঝোল ডালের বড়ি দিয়ে খাও……কপির ঘণ্ট খাও—যা খুশী।

বিশু খুড়ো জিব দিয়ে খানিকটা রসালো শব্দ করে জবাব দিলে, কেন আর ও সব কথা মনে করিয়ে দাও ভায়া – কতদিন যে ভালো-মন্দ জিনিস খাইনে সে কথা ভুলেই গেছি।

জনার্দ্দন সরকার মুখ চট্‌কে জবাব দিলে, সেজন্যে আর আমাদের ভাব্‌নাটা কি ? প্রতি বছর পৌষ-পার্বণে সন্ধ্যে বেলা সেন মশায়ের ওখানে সারা গ্রাম পাত পাতে। সেই পৌষ-পার্ব্বণের উৎসব ত' দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে যাবে।

সত্যি, উৎসব আস্‌বার অনেক আগে থেকেই ছেলে মহলে চল্লো আলোচনা আর পিঠের ফর্দ্দ তৈরী। কে কত পিঠের নাম করতে পারে তাই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। ক্ষীরের পুলি, আস্‌কে পিঠে, পাটি সাপ্‌টা, চন্দ্রপুলি, আউলা-ঝাউলা, পুলি পিঠে, চন্দ্রকাট, চিতৈ পিঠে, গোকুল পিঠে, পরচিত্ত-হরণী, রসপুলি, মুগ সাউলী আরো কত মজাদার নাম—যা মুখস্ত করে রাখ্‌তে হয়। এছাড়া পরমান্ন আছে আবার কত রকমের।

যারা নিজেরা নাম বল্‌তে পারে না বাড়ী থেকে ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে আসে।

প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা কবে থেকে চালের গুড়ো তৈরী করার কাজে লেগে গেছে !

ঢেঁকির শব্দ শোনা যাচ্ছে এবাড়ী থেকে ও বাড়ী—আর এ পাড়া থেকে—ও পাড়া !

মিঞা খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছে। আমার বাড়ি থেকে পৌষ-পার্ব্বণের দিনে সবাই খালি মুখে চলে যাবে—এ কখনো হ'তে পারে না!

তিনি বাড়ির মেয়েদের চাল-ডাল বের করতে বল্লেন, এমন সময় ছেলের দল এসে উপস্থিত।

রতন জিজ্ঞেস করলে, এত হৈ-চৈ কিসের? সব পিঠে-পায়েস আমরা আস্‌বার আগেই ফুরিয়ে গেল নাকি?

জনার্দ্দন সরকার চটে-মটে উঠে জবাব দিলেন, হুঁ। পিঠে খাবে না, উনুনের ছাই খাবে—

সেন মশাই হাঁ-হাঁ করে মাঝখানে এসে পড়লেন। বল্লেন, আজ পৌষ-পার্ব্বণের দিন। ছেলেদের কি এমন অলক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে? আমি কত আদর করে সবাইকে আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি।

ফটিক একেবারে ভেজা বিড়ালটির মতো শুধোলে, আচ্ছা ব্যাপারটা কি তাই আপনারা কেউ বলুন না। মনে হচ্ছে কি একটা ঘটনা ঘটেছে যা আপনারা সবাই আমাদের কাছ থেকে গোপন করছেন। খুলে বল্লে হয়ত আমরা সবাই মিলে সমস্যার একটা সমাধান করতে পারি—বিশু খুড়ো বল্লেন, হুঁ। হাতি ঘোড়া গেল তল—এখন ভেড়া বলে কত জল।

জনার্দ্দন সরকারের মনে দাগা লেগেছিল বোধকরি সব চাইতে বেশী। কাজেই তিনি মারমুখো হয়েছেন যেমন উগ্রভাবে—তেমনি সব কথা গড়গড় করে বলে গেলেন সবাইকার আগে!

ফটিক যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল!

বল্লে, আমরা গাঁয়ে থাক্‌তে এমন কাণ্ড হবে! আমাদের মুখের গ্রাস খেয়ে যাবে কোন্ বক-রাক্ষস? এ আমরা কিছুতেই হতে দেবোনা—!

ছেলের দল হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, কখনই নয়।

ফটিক আবার আকাশে হাত তুলে বল্লে, যে করে হোক পিঠে-পায়েস আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

ছেলের দল আবার চীৎকার করে বল্লে, নইলে আমরা সারারাত না খেয়ে থাক্‌বো, গোটা গ্রাম তোলপাড় করে তুল্‌বো। আসল চিজ আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

সেনমশাই ছুটে এসে ফটিকের হাতটা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, এ কাজ যদি তোমরা করতে পারো বাবা, তবে আমার মান রক্ষে হয়, নইলে গোটা গাঁয়ের লোকের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে?

ফটিক বল্লে, খুঁজে আমরা বের করবোই। কিন্তু আপনি আমাদের কি পুরস্কার দেবেন বলুন?

সেনমশাই আকুল আগ্রহে শুধোলেন, কি তোমরা চাও বল?

ফটিক জবাব দিলে, আজ ত' পিঠে-পায়েসের নেমন্তন্ন···তাহলে বলুন আপনি আমাদের ছেলের দলকে আর একদিন ভরপেট পোলাও-মাংস খাওয়াবেন!

সেনমশাই আনন্দের সঙ্গে মাথা নেড়ে বল্লেন, নিশ্চয়! নিশ্চয়!

তখন ছেলেদের মধ্যে খোঁজ-খোঁজ রব উঠে গেল! এ ছুট্‌ছে এদিকে, সে ছুট্‌ছে ওদিকে···আর একজন যাচ্ছে আর একদিকে—

ভানুমতীর খেলে কি হল বলা শক্ত!

আধ ঘণ্টা বাদে ছেলের দল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরে এসে বল্লে,

সব দিক ত' দেখা হল, কিন্তু রান্না ঘরটা ত' একবার আমরা দেখে যাই নি !

জনার্দ্দন সরকার রাগে যেন একেবারে ফেটে পড়লেন ! তেড়ে-মেরে উঠে একেবারে হাত নেড়ে বল্লেন, এতক্ষণ বাদে তোমরা এসে রান্নাঘর দেখ্‌তে চাচ্ছ ! খুব বুদ্ধি যা হোক ! সেখানে যে সব হাঁ-হাঁ করছে।

—তবু তদন্তটা পরিষ্কার করে হওয়া ভালো। ফটিক বিনীতভাবে অনুরোধ জানালে।

হতাশার সুরে সেনমশাই বল্লেন, চলো···, রান্নাঘরে আর কি দেখ্‌বে—

বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে শেকল খুলে দিলে,—পেছনে গ্রামের মোড়লগণ আর ছেলের দল !

কিন্তু দড়াম করে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুক্‌তেই সকলের কণ্ঠে একটা বিস্ময়ের সুর জেগে উঠ্‌ল !

একি !

থালে থালে. ডেক্‌চি, কড়াইতে— সব পিঠে-পায়েস···যেমনটি ছিল তেমনিই আছে ! এতটুকু খোয়া যায়নি !

বিশুখুড়ো চোখ তুটো বিস্ফারিত করে বল্লে, অ্যাঁ ! তাহলে কি সত্যিই ভানুমতির খেল !

জনার্দ্দন সরকার ভয় পেয়ে বল্লে, কিন্তু এ পিঠে-পায়েস আমি মুখে দিচ্ছিনে ! শেষকালে রাত্তিরে উঠে দেখবো আমি শুদ্ধ্‌ হাওয়া হয়ে গেছি !

ফটিক মৃত্থ হেসে কইলে, আসল কথা কিন্তু তা নয়। আমাদের

ছায়েদ মাথা নেড়ে বল্লে, হুঁ ! বাপজান জান্‌তে পারলে ত ? তোদের সঙ্গে বসে খাবো—তার মজাই আলাদা ! এই বলে সে মুখ চোট্‌কাতে লাগ্‌লো।

সেদিন সকাল বেলা সেনমশাই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বেশ আমেজ করে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টান্‌ছিলেন। ছেলের দল এই সময় গিয়ে হাজির হল তাঁর বাড়ীতে।

অনেকখানি ধোঁয়া এক সঙ্গে মুখ থেকে বের করে দিয়ে তিনি হাসিমুখে বল্লেন, মনে করিয়ে দিতে এসেছ বুঝি ? এই হাড়-কাঁপানো-শীতে আমার রোজই মনে পড়ছে। ওই দেখ, সরু চাল আনিয়ে রেখেছি। কাল রোদ্দুরে দিয়ে পরিষ্কার করে ঝেড়ে রেখেছে। শুধু এখন একটা পুরুষ্টু পাঁটা কিন্‌লেই হয়।

ছায়েদ আনন্দে লাফিয়ে উঠে বল্লে, আজকে উত্তুর চরের হাট। সেইখানে ভালো-ভালো পাঁটা কিন্‌তে পাওয়া যায়—, তা আপনি যদি অনুমতি করেন ত' আমরাই না হয় দল বেঁধে নৌকো করে গিয়ে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সেনমশাই উত্তর করলেন, নিশ্চয়ই তোমরা কিনে নিয়ে আস্‌বে। এই পাঁচটি টাকা নিয়ে যাও, আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি। তোমরা না এলে আজ আমিই তোমাদের ডেকে পাঠাতাম ! এই বলে তিনি ট্যাক থেকে পাঁচটি নগদ টাকা বের করে দিয়ে আবার গুড়ুক্-গুড়ুক্ তামাক টান্‌তে সুরু করে দিলেন।

এতে যদি উৎসাহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে না ওঠে—তবে আর কিসে উঠ্‌বে ? ছেলের দল সেনমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তক্ষুণি নৌকো ঠিক করতে চলে গেল !

আশে-পাশে যে সব নৌকো হাটের দিকে চলেছিল তাদের মাঝিরাও কান খাড়া করে গান শোনে আর গুড়ুক্-গুড়ুক্ তামাক টানে।

নদীর ওপর গান ত' শুধু কয়েকটি মিল দেওয়া কথা নয়! গানের সুর মিশে যায় নদীর স্রোতের ছল্‌ছলানির সঙ্গে, কাশ ফুলের দোলনের তালে, উড়ে যাওয়া বেলে হাঁসের ডাকের সাথে, ঝির ঝিরে হাওয়ার তালে-তালে, নীল আকাশের রঙের মধ্যে-মধ্যে। সবাই মিলে যেন হাততালি দিয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গত্ করতে থাকে। মনে হয়—সারাটা ভুবন ছুটে এসে তোমাদের সবাইকার সঙ্গে মিতালি পাতালো।

হ্যাঁ, হাট বল্‌তে হয় বটে একে!

এমন টাট্‌কা জিনিস্ আর কোথায় মিল্‌বে সহর অঞ্চলে? আনাজ, তরী তরকারী একেবারে লক্‌লক্ করছে—যেন মাটির সঙ্গে সংযোগ এখনো ওদের ছিন্ন হয় নি।

নদীর চরে জন্মেছে লাউ, কুমড়ো, পেঁয়াজ দেখ্‌লে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। পেঁয়াজকলিগুলো এত তাজা যে হাত দিয়ে টান্‌তে ভয় হয়, বুঝি গায়ে ব্যথা পাবে! পেঁপের মুখ দিয়ে বেয়ে পড়ছে সাদা কস্…মনে হয় তুলে আনা হয়েছে বলে ওদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে নীরবে। এমন তাজা তরী-তরকারী হাতে নিতেও সুখ।

শুধু কি তরী-তরকারী? পাকা ফলেরও অভাব নেই এখানে। যে দিনের যা—গাছ দু হাত মেলে দান করে যায়! রসে টুলটুল করছে, ভেজাল বল্‌তে কিচ্ছু নেই।

তাঁতিদের হাতে তৈরী; লোকে—বলে—জোলার ধুতি আর

গামছা। তাও সাজানো হয়েছে একদিকে থরে থরে। হুঁকো কল্‌কে তামাক টিকে—যত খুসী কিনে নাও। মাস বরাদ্দের সওদা কিনে অনেকেই নৌকো বোঝাই দিয়ে বাড়ী চলে যায়।

সকলের শেষের দিকে রয়েছে—ছাগল, গরু, ভেড়া, পশু-পক্ষী, হাঁস-মুরগীর হাট। কচি ঘাস খেতে পেয়েছে বলে ওদের তৈল-চিক্কণ দেহ সুন্দর দেখাচ্ছে। জল আর মাটির দেয়া নির্ম্মল খাদ্য ওরা পেট পুরে খেয়েছে, তাইত—পশুগুলির দেহেও কোনো রোগ-বালাইয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। পেটুকদের জিব যে আপনা থেকেই লালাসিক্ত হয়ে উঠ্‌বে—এতে আর ভুল কি?

ছায়েদ চোখ টিপে সবাইকে আগে থেকেই সাবধান করে দিলে, তোরা আবার দর-দস্তুর করতে যাস্‌নে যেন!

—কেন? কেন? জিজ্ঞাসা করে ফটিক।—তুই কি আমাদের বোকা পেয়েছিস যে দর করলেই ওরা আমাদের ঠকিয়ে দেবে?

ছায়েদ বল্লে, এ বোকা-চালাকের কথা নয়। এ হাটের দর-দস্তুরের নিয়ম কানুনই আলাদা। তোরা সে সব অন্ধি-সন্ধি ত' কিছু জানিস্‌নে! কি বল্‌তে কি বলে ফেলে আট্‌কা পড়ে যাবি ওদেরই কথায়। আমি বাপজানের আর ব্যাপারীদের সঙ্গে কতবার এসেছি। দর-দস্তুরের নমুনাটা কিছু কিছু শিখে নিয়েছি। কাজেই আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভালো।

ছায়েদের কথা বলার রকম-সকম দেখে সবাই সত্যি ভয় পেয়ে গেল! কি পথে দর চড়াতে হবে না জানা থাক্‌লে নিজের কথাতেই নিজের ধরা পড়বার সম্ভাবনা রইল! চার টাকার জিনিস যদি পাঁচ সিকে থেকে দর সুরু করতে হয় তবে একটা প্রাণের ভয়ের কথাও

খাওয়া শেষে হঠাৎ চট্‌পটি বল্লে, এই রে! মুড়ি দিয়ে পেট ভর্ত্তী করে রাখ্‌লাম—পোলাও-মাংস খাবো কি করে?

টোনাও তার কথা শুনে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠ্‌ল। কইলে, আমি যে ক্ষিদের চোটে পোলাও মাংসের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম! এখন উপায়?

ফটিক তখন ফোঁড়ন দিলে, আগে ছায়েদ পাঁঠা কিনুক তবে ত' খাওয়া! যা নমুনা দেখ্‌ছি···শেষ পর্য্যন্ত অজ আজ আমাদের কপালে নেই!

ততক্ষণে সন্ধ্যের আঁধার দিব্যি ঘনিয়ে এসেছে।

ছেলের দল আবার এসে নদীর ধারে হাজির হল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল। চুপ্‌চাপ সবাই পথ চল্‌ছে··· হঠাৎ কানে এলো—ব্যাঁ—অ্যা—অ্যা···!

শব্দ শুনে ছায়েদ একেবারে লাটিমের মতো ঘুরে গেল।

তাইত!

নধর পুরুষ্টু একটি লম্বকর্ণ—একা—একেবারে যাকে বলে দলছাড়া —গোত্রছাড়া।

ছায়েদ ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, চুপ! যেমন ব্যাটারা সবাই গলা-কাটা দর হাঁক্‌ছিল—তেমনি খোদা আমাদের কথা শুনে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন—

টোনা—জিব দিয়ে পড়ন্ত লালাটাকে টেনে নিয়ে কইলে, তুই ঠিক বলেছিস্ ছায়েদ! ভগবান ছোটদের আন্তরিক ডাক শুন্‌তে পান। ওটাকে নিয়ে চল। আশে-পাশে কেউ কোথায়ও নেই।

রতন ভয় পেয়ে বল্লে, না-রে! কেউ যদি দেখে ফেলে একেবারে কেলেঙ্কারীর সীমা থাক্‌বে না।

ছায়েদ চাপা গলায় ওকে একটা ধমক্ দিয়ে জবাব দিলে, আরে দেখবে কে? বিরাট হাট—কোত্থেকে একটা পাঁঠা দল থেকে ছট্‌কে পড়েছে—এখন হাজার হাজার পাঁটার মধ্যে সেটা খুঁজে বের করা কি সোজা কথা! আর আমরা যে এটাকে কিনি-নি তারই বা প্রমাণ

ফুল তোলার ভার নিলে; কয়েকজন ছেলে গেট্ সাজাবে, রঙীণ কাগজের শেকল তৈরী করে পূজা-মণ্ডপে লট্কে দেবে, কলা গাছ সংগ্রহ করবে কেউ কেউ; ভোগ রাঁধবার জন্যে প্রচুর বাসন দরকার। গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে সেগুলি জোগাড় করে আন্তে হবে। ভোগ রাঁধবার ভার নিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়বাবুর স্ত্রী। গাঁয়ের মেয়েরা তাঁকে হাতে-হাতে সাহায্য করবে।

অন্যান্য বার সরস্বতী পূজো উপলক্ষে বাইরে থেকে যাত্রাদল ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়। ফটিক, রতন, ছায়েদ এবার মহা উৎসাহিত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাছে প্রস্তাব পেশ করলে যে, তারা নিজেরা যাত্রা করবে। বাইরের লোকের হাতে অতগুলি টাকা গুনে দেবে না।

মজাদার খবর শুনে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মুখের হাঁ-টা বেশ বড় হয়ে গেল। তারপর তিনি হো-হো করে হেসে বল্লেন, আরে, তোরা কি যাত্রা করতে পারবি? ভেবে দেখ সবাই। চটপটি বল্লে, আপনি যদি আমাদের একখানা যাত্রার বই লিখে দেন তবেই আমাদের আর কোনো অসুবিধে নেই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুব হাস্তে লাগলেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, তোদের জন্যে আমায় যাত্রার দলের অধিকারী হতে হবে নাকি রে? তা—কাজটা নেহাৎ মন্দ নয়। শুন্তে পাই যাত্রাদলের অধিকারীরা খায় ভালো। সেরা জিনিস, মাছের মুড়ো, দুধটুকু মেরে ক্ষীরটুকু, গরম ভাতে গাওয়া ঘিটুকু—বলেই মৃত্যুঞ্জয়বাবু আবার হো-হো করে ছেলে মানুষের মতো হাস্তে লাগলেন।

কিন্তু ছেলেদের দলও নাছোড়-বান্দা। কিছুতেই তারা ওঁকে ছাড়বে না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একেবারে কড়া বিচারক।

'ড়' এর যায়গায় 'র' অথবা 'চাঁদ' এর স্থানে 'চাদ' বল্‌লে তাঁর কাছে নিষ্কৃতি পাবার যো নেই! ভালো এবং পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ কর্‌তে না পার্‌লে. তিনি পার্ট দেবেন না—সে যতই চাঁদার লোভ দেখাক্ না কেন!

চিরটাকাল পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশে কাটিয়েছেন বলে নানা ভাষার উচ্চারণভঙ্গী তাঁর অতি সুন্দর। প্রতি সন্ধ্যায় তাই তাঁর দাওয়াতেই মহলার আসর বস্‌তে লাগ্‌ল। গাঁয়ে যে এত গুণী লুকিয়েছিল একথা ছেলেরাও জান্‌তো না; আর মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ছিল ধারণার অতীত। ফলে কন্‌সার্ট পার্টি আপনা থেকেই এইভাবে গড়ে উঠল। কেউ ভাঙা বাঁশী, কেউ তালিমারা ঢোলক, কেউ ভাঙা খোল, কেউ তার-ছেঁড়া বেহালা নিয়ে এসে হাজির হল। তারপর যে ঐক্যতান বাদন সুরু হল—বুঝি তার তুলনা মেলা শক্ত।

যেমন বাজে বাদ্যি—তেমনি চলে অ্যাক্‌টিং।

জ্যাঠাইমা গরম মুড়ি আর শশার কুচি জোগাতে জোগাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলেন। বল্লেন,—কাজ করতে ভয় পাইনে। কিন্তু কন্‌সার্টের শব্দে কানের পোকা বেরিয়ে গেল বাপু!

পুকুর ঘাটে মেয়েরা বলে, আপনার ভারী সুবিধে। আগে থেকেই সব কিছু শুনে আর জেনে নিচ্ছেন।

জ্যাঠাইমা বিরক্ত হয়ে জবাব দেন—সে সুবিধেটে তোমরা বাপু ভাগ করে নাও। আমায় রেহাই দাও। তোমরা গিয়ে সন্ধ্যে থেকে সবাই কন্‌সার্ট শোনো, আর আমাকে তোমাদের বাড়িতে ঠাঁই দাও।

কেন? কেন? কেন?

নানা দিক থেকে এক সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে।

জ্যাঠাইমা বলেন, শুন্‌বে—কেন? সন্ধ্যে থেকে কন্‌সার্ট পার্টির জন্যে কল্‌কে-কল্‌কে তামাক সাজতে হয়। ভদ্রলোকের ছেলেরা এত রাত অবধি গলা ফুলিয়ে বাজাচ্ছে—তাদের না বল্‌তে পারিনে। সবাই প্রায় আমার ছেলের বয়সী। তাই ওদের সুখ-সুবিধেটা দেখতে হবে বৈ কি!

একজন বয়স্কা মহিলা শুধোন, আর কি বায়নাক্কা ওদের শুনি?

—বায়নাক্কা খুব বেশী নয়। মুড়ি, শশা, বাতাসা এই সব জোগাতে হয় মাঝে মাঝে—নইলে অত দম থাক্‌বে কেন? তবে হ্যাঁ;—সব চাইতে বিপদ হচ্ছে সেই কন্‌সার্ট পার্টির সবাই যখন এক সঙ্গে বাজাতে সুরু করে। মনে হয়—ব্রহ্মতালু অবধি শুকিয়ে উঠ্‌ল, আর কানের পোকা যদি কিছু থাকে সব বেরিয়ে এলো!

নতুন শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে—এমন একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু জ্যাঠাইমা কন্‌সার্টই সব নয়। যখন অ্যাক্‌টিং সুরু হয়—ভারী ভালোলাগে কিন্তু। শুন্‌লাম 'একলব্য' পালা হচ্ছে। তা জ্যাঠাইমা 'এক'ই বা কে সাজবে, আর 'লব'ই বা কে হবে?

জ্যাঠাইমা হাসি গোপন করে জবাব দিলেন, সে ভাই অত কথা আমি জানিনে। তেল নুন দিয়ে মুড়ি মাখ্‌বো, না তামাক সাজবো, না 'বক্তিমে' শুন্‌বো? ও যাত্রার পালা যে লিখেছে তাকেই গিয়ে না হয় একদিন জিজ্ঞেস করো।

মেয়েটি বল্লে, যাবো। নিশ্চয়ই যাবো। মেসোমশাইকে সব শুধিয়ে জেনে আস্‌বো। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আবার দ্যাওরদের কাছে

পরিশ্রম করে তত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, আরো ভালো করা চাই। এ অঞ্চলের সবাইকার যেন দেখে তাক্ লেগে যায়!

পূজোর ফলের জন্যে ছেলেদের পয়সা খরচ করতে হয় না। সারা গাঁয়ে এতগুলি ফলের বাগান রয়েছে তবে কিসের জন্যে? তা' ছাড়া বহু কলাগাছ কেটে নিয়ে এসে এমন সুন্দর তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করেছে যে, তাদের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়। মেয়েরা বসে গেছে যার যার বাড়ীতে রঙীণ কাগজের শেকল তৈরী করবার জন্যে। ছোট ছোট ভাইরা ছুটোছুটি করে জিকা গাছ থেকে আঁটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দিদিদের মনোস্তুষ্টি করছে।

ছেলেদের মধ্যে কথা হচ্ছে—না খেয়ে অঞ্জলি দিতে হবে; নইলে বিদ্যে হবে না।

ঘণ্টে বল্লে, চট্‌পটি ত' সেই কবে কুল খেয়ে বসে আছে। ওর অঞ্জলি দিয়ে কি লাভ হবে শুনি?

চট্‌পটি ফোঁস করে উঠে জবাব দিলে, কেন, কুল খেলে কি হয়? —কী হয়? ঘণ্টের চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হল এমন আশ্চর্য্যজনক কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি! ভ্রূ কুঁচ্‌কে বল্লে, কেন, যে কথাটা গাঁয়ের বাচ্চা ছেলে পর্য্যন্ত জানে তুই সে কথা জানিস্ না নাকি? সরস্বতী পূজোর আগে কেউ কুল খায়? যে খায় তার বিদ্যে হয় কাঁচকলা! এই বলে সে দুটো বুড়ো আঙুল উঁচু করে দেখালে!

এই জরুরী ঘোষণার পর চট্‌পটিকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হল। কেননা-তার পক্ষ টেনে কথা বলে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না!

দ্রোণাচার্য্য আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলে—

গিয়াছিনু যমুনার তীরে – আহ্নিকের তরে—

অকস্মাৎ পদচ্যুত হয়ে—পড়িলাম অগাধ

সলিলে—

মোক্ষদা মাসির দুষ্টু বোনপোটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে—

নহে যমুনার তীরে—

গিয়াছিলে মাসির আলয়ে-

তাই ক্যালেণ্ডারের পাতার ওপর লোভ পড়ে থাকে সক্কলকার। অনেক সময় এমন কাণ্ডও ঘটে যে, মাস শেষ হয়নি, তবু দেয়াল থেকে হু'তিনটি পাতা উধাও হয়ে গেল !

কে নিলে—? – কে নিলে ? চারদিক থেকে বড়দের প্রশ্নবানে সবাই জর্জ্জরিত হতে থাকে। শেষকালে দেখা যায় যে, মিণ্টু তার ভূগোলের মলাট দিয়ে বসে আছে; কিম্বা গোবিন্দ তার পাটিগণিতের ওপর আটা দিয়ে দিব্যি লেপ্‌টে দিয়েছে। এই জাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

বছরের প্রথম দিকে নতুন বই পড়া যত না হয়—ঘটা হয় তার চাইতে অনেক বেশী। কে ক' খানা নতুন বই কিনেছে, কার বইয়েতে ক'টা ছবি আছে, কার বইয়ের ছাপা ভালো, রঙীণ ছবি কোন বইয়ে বেশী—এইসব আলোচনাই ছেলে মহলে বেশী চলে। অনেকে শ্লেট ভেঙে ফেলেছে, নতুন বই কেনার সময়ে নতুন শ্লেটও চাই। নইলে কান্নাকাটি সুরু করে দেবে ! যারা একটু ওপরের ক্লাশে উঠেছে তাদের আবার শ্লেট-পেন্সিলে চলবে না, রুল টানা খাতা আর সেই সঙ্গে চাই পেন্সিল। এই পেন্সিল নিয়ে আবার নানা রকম ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়। সোজাসুজি গোল পেন্সিল কিন্তু ছেলে মহলে বিশেষ আদর পায় না। চারকোণ, আটকোণ পেন্সিল হবে, ঝক্‌ ঝকে বার্নিশ আর চক্‌চকে রঙ থাক্‌বে—তবে সেগুলি শিশু ও কিশোর মনে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে। আবার যাদের পেন্সিলের পেছন দিকে খানিকটা রবার লাগানো থাকে—গর্ব্বে তারা ত' ক্লাশের মধ্যে কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বল্‌তেই চাইবে না ! কাজেই নতুন ক্লাশে উঠে পড়ার চাইতে সাজ-সরঞ্জামের ঠাট্‌টাই বেশী চোখে ধরা পড়ে।

কুমোর খুড়ো মোড়ার ওপর বসে ক্রমাগত তামাক টান্‌ছে আর কেবলি বকে যাচ্ছে!—গাঁয়ে ত' আরো অনেক ছেলে রয়েছে। তারা কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে; পড়াশুনা শিখ্‌ছে—! তোর মতো ঘরের দরজা বন্ধ করে খুন-খারাপির ব্যবসা কে সুরু করেছে শুনি? দূর হয়ে যা' তুই আমার বাড়ী থেকে। আর আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই নে!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, আহা কুমোর খুড়ো, মুখ না হয় এখন না-ই দেখ্‌লে। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার ছেলেটা বাঁচ্‌লো—না—মরলো। কোথায় সে হতভাগা?

কুমোর খুড়ো মুখ ভার করে উত্তর দিলে, ওই ঘরের ভেতর পড়ে গোঙাচ্ছে, মরুক হতচ্ছাড়া আমি দেখতে চাই নে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ছুটে ভেতরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও! ছায়েদ এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা ওর একেবারে উড়ে গেছে। চারিদিকে পট্‌কা তৈরীর জিনিসপত্তর ছড়ানো। যন্ত্রণায় চট্‌পটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বল্লেন, কিন্তু সবার আগে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া দরকার। ওষুধ আমার কাছে যা' কিছু ছিল—আমি পকেটে করে নিয়ে এসেছি। খানিকটা সাদা ন্যাকড়া যে দরকার। ময়লা হলে চল্‌বে না।

এইবার কুমোরখুড়ো হুঁকোটা রেখে আস্তে আস্তে উঠ্‌ল, তারপর একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া বের করে দিয়ে—একটি কথাও না বলে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল। ছেলের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

ছেলের দল—শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর ইত্যাদি নিয়ে। বাড়ী কর্ত্তারা সবাই চলেছেন মিছিলের সঙ্গে শুধু পায়ে। এইভাবে প্রত্যেক বাড়ী থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে মিলিত হয়—দোলভিটেয়। সেখানে দোল-উৎসবের সঙ্কীর্ত্তন চল্‌বে—অনেকরাত ধরে।

ছেলেরা কিন্তু দোল ভিটেতে এসেই আবীর আবার খেল্‌তে সুরু করে দিয়েছে। সারা সকাল রঙে লাল হয়ে সারা দুপুর পুকুরে ঝাপ খেয়েছে তবু ওদের খেলা মেটেনি – তাই এবেলাও সুরু হয়েছে নতুন করে আবীর খেলা। অবশ্য এ বেলা কাদা, রঙ, আল্‌কাতরা ইত্যাদি চল্‌বে না, শুধু শুক্‌নো আবীর যে যতো খেল্‌তে পারে।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে আর নীচে ছেলে মেয়েদের ফাগ নিয়ে লুকোচুরি খেলা।

বুড়োর দলও কিন্তু চুপ্‌চাপ বসে নেই ; থেলো হুঁকো টানার ফাঁকে ফাঁকে তাদের চলেছে টাকে আর পাকা দাড়িতে ফাগ মাখানো। কীর্ত্তনীয়া দলও দোহা গাইতে গাইতে লাল হয়ে উঠেছে আবীরে।

রাত যত বেড়ে চলে—কীর্ত্তন তত জমে ওঠে।

বাড়ীর কর্ত্তারা এইবার ছেলেদের পাঠিয়ে দেন বাড়ীতে। নইলে তাদের অসুখ করবে।

ওরা রাত্তিরে মালপোয়া আর ঘন ক্ষীর খেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুম তাদের চোখের পাতা থেকে ছুটি নিয়েছে।

গভীর রাত পর্য্যন্ত সবাই জেগে থাকে।

তখনো দূর থেকে ভেসে আসে দোল-ভিটের কীর্ত্তনের গানের কলি—

"তমাল শাখে বাঁধা ঝুলনা—
দোল খেলিব আমরা দু'জনা!"

সেলামী দিয়ে 'দেবতা-তুষ্ট 'রাখ্‌তে হয়। নইলে খরা বসানো চল্‌বে না।

এই খরা থেকে অতি উৎকৃষ্ট মাছ সংগ্রহ করবার জন্যে অনেক সময় ছেলেদের মধ্যে বাজী রাখা হয়। অন্ধকার থাকৃতে— কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি চলে আসে এক-একজন। তাদের কপালে প্রথম ক্ষেপে খুব ভালো মাছ জোটে।

সেদিন কথায় কথায় ছায়েদ আর ফটিক খুব উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল।

ফটিক বল্লে, আমি যদি ইচ্ছে করি রাত্তিরের যে কোনো সময়ে ঘুম থেকে উঠে মাছ নিতে আস্‌তে পারি।

ছায়েদ ভ্রূ কুঁচ্‌কে জবাব দিলে, আমার সঙ্গে আর পারতে হবে না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্তির হোক—আর ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত হোক—আমার চোখ অন্ধকারে জোনাকীর মতো জ্বলে। কিছুতে আমি পেছ পা নই।

···আর আমিই বুঝি ভয় কাতুরে? ফটিক বুক চিতিয়ে জবাব দেয়। ছায়েদ বল্লে, অত কথা কাটাকাটি করে লাভ কি? একদিন দেখাই যাক্ না—

ফটিক বল্লে, বেশ বাজি রাখো—

ছায়েদ জবাব দিলে, ঠিক। বাজিতে আমি খুব রাজি।

বেশ - যে আগে এসে খরা থেকে মাছ জোগাড় করে নিতে পারবে তাকে অন্য জন দু'সের চম্‌চম্‌ খাওয়াবে।

বাজি রাখ্‌বার সময় ছেলেদের উৎসাহ একেবারে ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো চড়াৎ করে উঁচু তাপে উঠে যায়।

দিনের আলোতে সকলের সাম্‌নে বাজি রাখা খুবই সোজা। কিন্তু

সাম্‌নে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে—যেদিকে তাকায় শুধু রাশি-রাশি অন্ধকার। মানুষ ত' নেই-ই—একটা কুকুর, বেড়াল কিম্বা চামচিকের পর্য্যন্ত টিকি দেখ্‌বার যো নেই!

মনে হল নিজের বুকের ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ শব্দ সে নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। শীতও যেন তার আরও বেশী মনে হল। আলোয়ানটা বেশ ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ভয় তাড়াবার জন্যে ফটিক চীৎকার করে হেঁড়ে গলায় গান ধরল! কিন্তু যত চীৎকার করে সে গাইবে ভেবেছিল—গলার স্বর ততটা চড়া হচ্ছে না কেন? পেছনকার অদেখা লোকটি তার গলার সুরও চুরি করে নিচ্ছে নাকি?

ফটিকের গলা ওই শীতেও শুকিয়ে উঠ্‌ল। মনে হল তার ভয়ানক জল তেষ্টা পেয়েছে।

শুধু সে মরিয়া হয়ে পথ চলছে!

হঠাৎ সে ওপরের দিকে তাকালো। এখানে অনেকগুলি ঝাঁকড়া গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে অন্ধকারটাকে আরো গাঢ় করে তুলেছে।

ওপরের নক্ষত্রলোক থেকে যে পরিমাণ আলো এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়—তাতে দেখা গেল—সাদা থান পরা একটা মেয়েছেলে দুটি ডালে দুই পা রেখে—একটা গাছের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ফটিক পথের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ অন্য এক দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের ভুলও ত' হতে পারে!

সমস্ত বিষয়টাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জন্যে সে আবার সেই গাছের ডালের দিকে তাকালে

ওরা মাঝ রাত্তিরে ভয় পেয়ে কুপি জ্বালিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। গাঁয়ের ছেলে ফটিক—সবাই তাকে চেনে। ধরাধরি করে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

যার বাড়ীতে ফটিককে তোলা হল—পড়ার সবাই তাকে করিম চাচা বলে ডাকে। করিম চাচা বয়স্ক লোক। সবাই তাকে মানে আর খাতির করে। ফটিকের ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে বল্লে, কী বিপদ! একেবারে দাঁত কপাটি লেগে গেছে যে!

তুক্‌তাক্ জানা আছে করিম চাচার। ছায়েদের দিকে তাকিয়ে বল্লে, ভয় পেয়ে এমন হয়েছে। তা তোমাদের রাত বিরেতে অন্ধকার দিয়ে যাওয়ার কি বাপু? সাপ-কোপেরও ত' ভয় আছে। আমি জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌ছি এক্ষুণি,—কিন্তু ওর বাড়ীতে একবার খবর দেয়া উচিত—

ছায়েদ আঁৎকে উঠে বল্লে, না-না। এত রাত্তিরে আবার বাড়ীর মানুষদের ব্যস্ত করে কি লাভ? আমিই ত' রয়েছি সঙ্গে, তুমি যা হয় ব্যবস্থা করো করিম চাচা—

তক্ষণি বাইরে গিয়ে বাগান থেকে খুঁড়ে কি গাছের শেকড় নিয়ে এলো করিম চাচা। তারপর সেইটে ফটিকের নাকের কাছে ক্রমাগত ঘোরাতে লাগ্‌লো।

মিনিট দশেকের মধ্যে ফটিক চোখ মেলে তাকালো।

প্রথমে ওর কিছুতেই মনে আসে না—কোথায় সে আছে! তারপর ছায়েদের দিকে চোখ পড়তে সব কথা তার স্মরণে এসে গেল।

ফটিক নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লে, বাজি আমি কিছুতেই হারতাম না - কিন্তু ওই ভূ—ত!

—ভূ—ত ! আঁৎকে উঠ্‌ল ছায়েদ।

শুধোলে, কোথায় ভূত দেখ্‌লি তুই শুনি ?

ইতিমধ্যে করিম চাচা নিজের গোয়াল ঘর থেকে সদ্য দোয়ানো এক বাটী দুধ নিয়ে এসে হাজির। বল্লে, এইটুকু গরম গরম খেয়ে ফেল দেখি। সদ্য বাঁট থেকে এনেছি—দেখছ না এখনো গরম রয়েছে——ফুলে আছে ফ্যানায়। কথাটি কয়ো না ; ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেল দেখি—শরীরে বল পাবে।

ফটিকের কোনো আপত্তি টিক্‌লো না। ফ্যানা শুদ্ধ এক বাটি দুধ তাকে ঢক্ ঢক্ করে খেতেই হল শেষ পর্য্যন্ত। বাটি নিয়ে করিম চাচা চলে যেতে ঘর আবার নিরিবিলি হল।

ছায়েদ ওকে ফিস্ ফিস্ করে শুধোলে, হ্যাঁরে ফট্‌কে, ভূত দেখ্‌লি তুই কোথায় ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে !

চোখ দুটি বন্ধ করে ভীতিকাতর কণ্ঠে ফটিক আস্তে আস্তে জবাব দিলে, ভুত নয় রে ছায়েদ—পেত্নী !

—পেত্নী !—ছায়েদ আবার যেন আঁৎকে ওঠে ! ভাগ্যিস তোকে একা পেয়ে ঘাড় মটকায় নি।

ফটিক এইবার চোখ মেলে তাকিয়ে বল্লে, সেই সময় 'রাম' নামটা কিছুতেই মনে হল না ! নইলে কি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি ?

ওদিকে পূব দিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

ছায়েদটা গোঁয়ার গোবিন্দ আছে। বল্লে, কিন্তু আমি তোর পেত্নীকে না দেখে কিছুতেই যাচ্ছিনে। যায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে।

ফটিক এইবার অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। জবাব দিলে হ্যাঁ

গাজনের সন্ন্যাসীরা নানারকম মুখোস পরে—শিব নাচ, কালী নাচ বুড়ো-বুড়ির নাচ, রঙ্-তামাসা প্রভৃতির আয়োজন করে।

এই জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান আর রঙ্-তামাসায় পল্লী-কবিদের খুব খাতির বাড়ে। নতুন-নতুন কবিতা লিখ্‌তে হবে, ছড়া কাট্‌তে হবে। গাঁয়ের সমাজ-জীবনের কথা, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীর কাহিনী, রস-রসিকতার বিবরণী—সব গাঁয়ের কবিরা মুখে-মুখে তৈরী করে দেয়। ওদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানে না নিরক্ষর; কিন্তু তাদের কবিত্বশক্তি আর মিলের বাহাদুরী দেখে বিস্মিত হতে হয়। বুড়ো-বুড়ীর মুখ দিয়ে গ্রামের অনেক ঘটনা কৌশলে বলে দেয়া হয়—যা' শুনে এক দল রেগে টং হয়ে ওঠে,—আবার আর এক দল—হাততালিতে বাহোবা দেয়!

মুখোস পরে কালী নাচ সত্যি দেখ্‌বার মতো।

ঢাকের তালে-তালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা নেচে চলে এতটুকু পরিশ্রান্ত হয় না, এই আশ্চর্য্য।

মাঝে মাঝে নাচতে নাচ্‌তে নর্ত্তক ভিরমী খেয়ে পড়ে যায়। ক্রমাগত মাথাটা পাগলের মতো ঘোরাতে থাকে। তখন লোকে বলে মা কালী 'ভর' করেছেন।

গাঁয়ের লোক সেইসময় একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে। যার যা জিজ্ঞেস করবার ব্যস্ত হয়ে শুধোতে থাকে। কোন্ বউয়ের ছেলে হয় না—অষুধ চাই, হাঁপানির ব্যামো সারিয়ে দিতে হবে, কে মাম্‌লা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে—ফলাফল জান্‌তে চায়! সবাই যে জবাব পায় তা নয়। যার উত্তর মিল্‌লো—সে খুশী হল—, যার মিল্‌লো

তক্ষুনি লাঠির ঘায়ে ওরা দুটোকে দুদিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কিম্বা একটিকে ধরে খোঁয়াড়ে আট্‌কে রাখ্‌ছে।

আগে এই মেলাতে জুয়াখেলারও প্রচলন ছিল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবুর চেষ্টায় সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

তার বদলে লাঠি খেলার চল হয়ে উঠেছে সুন্দরভাবে। শুধু যে হিন্দুরাই লাঠি খেলার কসরৎ দেখায় তা নয়। দলে দলে মুসলমান ছেলেরাও আসে কোমরে কাপড় জড়িয়ে। মাথায় থাকে লাল গামছা বাঁধা। হা-রে-রে-রে শব্দে যখন খেলা সুরু হয় তখন সাত গাঁয়ের লোক মজা দেখ্‌বার জন্যে ভেঙে পড়ে।

এই লাঠি খেলাটা হয় মাসের শেষের দিন।

খেলা শেষে ফেনী বাতাসা কিনে জয়ধ্বনি দিতে দিতে সবাই ঘরে ফিরে যায়।

ফটিকদের বাড়ী সেইদিন রাত্তিরে শেষ পালি জাগানো'র উৎসব হয়। গাজনের সন্ন্যাসীদের নেমন্তন্ন থাকে ওদের বাড়ীতে—এই অনেক দিনের প্রথা। গাঁয়ের গিন্নিরা কোমরে আঁচল জড়িয়ে আপনা থেকেই এসে হেঁসেলে ঢোকে। তাদের এই ধারণা যে, গাজনের সন্ন্যাসীদের নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ালে পুণ্যি হয় প্রচুর। এই দিনকার উৎসবে কাউকে নেমন্তন্ন করতে হয় না। এসো, 'পালি জাগান' দেখো, কলার পাতা নিজের হাতে বাগান থেকে কেটে নিয়ে পংক্তি ভোজনে বসে যাও। খাওয়া দাওয়ার পর আবার পালি জাগানোর আসরে গিয়ে রাত জাগো, আর না হয় বাড়ী চলে যাও। যেমন তোমার খুশী।

অন্ততঃ একটা রাত্তির মনে করে নিতে হবে—এটা তোমার

বাড়ী-ঘর। সুখ-সুবিধে সব তোমাকেই দেখে নিতে হবে। হেথা নাহি আবাহন—নাহি বিসর্জ্জন।” সবাই আপন—কেউ পর নয়।

ফটিকদের বাড়ীর লোকেরা বলে যে, পাটঠাকুরের দয়ায় তাদের কোনো দিন ডাল-চালের অভাব হয় নি। খিচুড়ী রান্না হচ্ছে হাঁড়িতে হাঁড়িতে! ক্ষেতের তরী তরকারী; সেই থেকে তৈরী হচ্ছে—বেগুন ভাজা, লাবড়া—ইত্যাদি! একটা তেঁতুলের টক—আর মিঠাই। মিঠাইটা সরবরাহ করে গাঁয়ের হালুইকররা—এই চিরকালের প্রথা। কোথেকে কি আস্‌বে কেউ আগে জানে না। কিন্তু ঠিক এসে সব জুটে যায়।

বাড়ীর গিন্নি-বান্নিরা বলে, যার ব্যাপার সেই দেখে শুনে নেবে এখন। অন্নপূর্ণা যার ঘরের বৌ—তার কাজ আট্‌কে থাক্‌বে কেন? আমরা ত' উপলক্ষ্য মাত্র।

সত্যি তাই, চিরকাল এই ব্যবস্থায় কাজ চলে আস্‌ছে।

ওদিকে পালা-জাগানোর আসরে বুড়ো বুড়ীর সঙ্‌ খুব জমে উঠেছে। গান হচ্ছে—

“বুড়ী তুই গাঁজার জোগাড় কর্‌
তোর জামাই এলো দিগম্বর।”

হঠাৎ বুড়ো-বুড়ীর রসিকতাকে ছাপিয়ে দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো।

প্রাচীনরা বল্লেন, ও কিছু নয়। চরের হাট থেকে সব লোক সওদা নিয়ে ফিরছে—এ তারই গণ্ডগোল।

বুড়ো-বুড়ীর রসিকতা আসরে আবার জমে উঠ্‌ল। সেই আসরের এক কোনে ছেলেরাও বসে ছিল। হঠাৎ রতন বল্লে, এই যে আজ

একেবারে জয় ঢাক হয়ে আছে। মা বল্লেন, তা হলে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড় গে---

মা ছেলের দিকে সস্নেহে একবার তাকালেন। যা যজ্ঞি-ব্যাপার নিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন—ছেলেরা ভালো করে খেলো কি না খেলো তাকিয়ে দেখ্‌বার ফুরসৎও তাঁর নেই!

অনেক রাত্তিরে 'পালি জাগান' শেষ হল। তখনও বহু লোকের খাওয়া বাকি ছিল। ফটিকের মা সব কিছু চুকিয়ে যখন বিছানার আশ্রয় নিলেন তখন তাঁর শরীর আর বইছে না কোনো মতেই! পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। কাল আবার ছেলেদের নববর্ষ-উৎসব। ফটিক ভোর বেলা গ্রাম-সঙ্কীর্ত্তনে বেরুবে। ছেলেটা সারা রাত উপোসী রইল। খুব সকালে চিড়ে-মুড়ি যা হোক কিছু খাইয়ে দিতে হবে। নইলে যে দুরন্ত ছেলে, কখন ফিরবে তার ঠিক কি! ঘুমের মধ্যেও মাকে চিন্তা করতে হয়। একটা ছেলেকে এই এতটুকু থেকে মানুষ করে গড়ে তোলা কি সহজ কথা?

সমস্ত গ্রামটাই শেষ রাত্তিরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কয়েকদিন ধরে তাদের ওপর দিয়ে ধকল বড়ো কম যায় নি।

আজও অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে তারা এখন সবাই পাথরের মূর্ত্তির মতো ঘুমুচ্ছে। ঠেল্‌লেও কেউ সাড়া দেবে না। এত ক্লান্ত তারা।

সেই যে বুড়ো-বুড়ীর গানের সময় দূর থেকে একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছিল—সেটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। তারপর মনে হল সেই কোলাহলটা গ্রামের দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে।

সারা তুলসীতলা গ্রামটা যেন রাক্ষসদের যাদুদণ্ডের প্রভাবে পাষাণ-

হাতে একটি করে লাঠি কিম্বা ছোরা। যারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জান্‌লায় জান্‌লায় পাহারা দিচ্ছে—তাদের হাতে আবার বন্দুকও রয়েছে।

শিয়রের কাছে আবার সেই গোঙানিটা শুনে চোখ ফেরাতেই তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন ছলাৎ করে মাথায় গিয়ে উঠ্‌ল? তার মাকে দুটো গুণ্ডা ধরে রয়েছে—একটা লোক চাদর দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলেছে। আর গুণ্ডা দুটো নির্ম্মমভাবে তার মার গা থেকে গয়না খুলে নিচ্ছে। ফটিকের শিয়রের কাছে ছিল একটা রাম-দা, বেড়ার সঙ্গে ঝোলানো থাক্‌তো চিরকাল। ফটিক এক লাফে উঠে সেই রাম-দাটা টেনে নিয়ে একটা গুণ্ডার পায়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করলে।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন তার মাথায় লাঠি বসিয়ে দিলে। ফটিক সেইখানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল!

সতেরো

ফটিক স্বপ্ন দেখ্‌ছে—

সে কেবলি জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নেবার যত চেষ্টা সে করছে—মনে হচ্ছে তার দম বন্ধ হয়ে এলো! সে ত' খুব ভালো সাঁতার কাট্‌তে জানে—তবু জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে কেন সে কথা কিছুতেই তার মগজে ঢুক্‌ছে না। ক্রমাগত সে হাত পা ছুঁড়ছে, দেহ তার অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। তবু সে জল কাটিয়ে, ঠেলে ওপরে উঠ্‌তে পারছে না। এ রকমভাবে আর কতক্ষণ সে যুঝ্‌তে পারবে?

তবু চোখ মেলে চেয়ে আসল ব্যাপারটা দেখ্‌বার মতো মনের বল সে নিজের ভেতর খুঁজে পেলে না !

গুণ্ডাগুলো কি এখনো আছে—না, তাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে ?

কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ত' !

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা ভৌতিক ঘটনার মতো আকস্মিক ঘটে গেল !

তবু ভয়ে ভয়ে সে চোখ খুলে চাইলে ।

সকলের আগে যা দেখে সে আঁৎকে উঠ্‌ল—তা হচ্ছে ওর বাবার মৃতদেহ ।

মাথাটা দেহ থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে—আর রক্তে সারা মেঝে ভেসে যাচ্ছে !

এই রকম বীভৎস দৃশ্য দেখবার অভিশাপ কটা ছেলের অদৃষ্টে ঘটে ? চীৎকার করে উঠ্‌তে গেল ফটিক ।

কিন্তু মনে হল—গলা থেকে কোনো শব্দই বেরুচ্ছে না !

যেন তার কণ্ঠে কেউ গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে ।

ভারী মাথাটাকে প্রাণপণে তোল্‌বার চেষ্টা করলে সে । কপালের শিরাগুলো দপ্‌ দপ্‌ করছে ।

কিন্তু হতাশ হয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না ।

গুণ্ডাগুলো তার মায়ের মুখ বেঁধে গয়না কেড়ে নিচ্ছিল । সেই দৃশ্য তার চোখের ওপর ভাস্‌ছে । মাকে না দেখ্‌লে সে মনে এতটুকু স্বস্তি পাবে না ।

যখন তার জ্ঞান ছিল না—মাথার দারুণ ব্যথায় অজ্ঞান অবস্থায়

নিয়ে জলের কলসীটা হাত দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে মায়ের কাছে এসে হাজির হল। তারপর ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত তাঁর মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল।

চোখ দুটো কিন্তু তার স্থির হয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। যদি একটু নড়ে ওঠে,—কিম্বা চোখের একটু পলক পড়ে।

আরো জল,—আরো জল। মায়ের মুখ-চোখ-বুক ভেসে জল মেঝেতে গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো, তবু ফটিক থাম্‌লো না।

যত জল ফটিক ঢাল্‌ছে—তত জল তার দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ওর নিজের চোখের জলও কি মায়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না?

হঠাৎ ফটিকের মনে হল—মায়ের চোখের পাতাটা একটু নড়ে উঠ্‌ল।

সে বুক ফাটা চীৎকার করে উঠ্‌ল, মা—মা—মা—

মায়ের কানে সন্তানের সে ডাক গিয়ে বুঝি পৌঁছলো। ধীরে ধীরে মা চোখ মেলে তাকালেন।

কিন্তু কোথায় আছেন মা? কেন তিনি মাটিতে শুয়ে? ফটিকই বা কেন তাকে সজল চক্ষে, ব্যাকুল কণ্ঠে এমনভাবে ডাক্‌ছে? মা বুঝতে পারছেন না—তার সংসারে কি ওলট-পালট হয়ে গেছে! চেতনার রাজ্যে পা বাড়াবার মুখে মা আবার চোখ দুটি বন্ধ করলেন। মাথাটা আবার বেঁকে পড়ল ঘাড়ের দিকে। মেঝের জলে চুলগুলি একেবারে ভিজে উঠেছে। মায়ের সারা মুখে যেন এক দোয়াত কালী ঢেলে দিয়েছে।

মা—মাগো—বলে ফটিক আবার ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল। সেই

অতি চরম বিপদেও মা সন্তানের জন্যে সব কিছু করতে পারেন। হয়ত সেই সন্তানকে নিরাপদে কোনো যায়গায় নিয়ে যাবার স্বাভাবিক-আকর্ষণেই মন্ত্রমুগ্ধার মতো মা উঠে বস্‌লেন।

মাকে বাঁচাবার এই শেষ সুযোগ ফটিক কোনো মতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারে না। নিজের শরীরে যতখানি শক্তি আছে সব এক সঙ্গে জড় করে সে মাকে জড়িয়ে ধরল ; তারপর পাছে মা অন্যদিকে তাকিয়ে হত্যালীলা আবার প্রত্যক্ষ করে তাই সরাসরি খোলা দরজা দিয়ে তাঁকে একেবারে বাইরে নিয়ে এলো।

কিন্তু ফটিকের দৃষ্টি রয়েছে একেবারে সজাগ।

তখনো কাল রাত্রি প্রভাত হয় নি।

ধ্বংস ও হত্যার অশুভ ডানা অমা-রজনী তখনো গুটিয়ে ফেলে নি। নিশা আর ঊষার সন্ধিক্ষণে ফটিক মায়ের হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ উঠোনের বাঁ দিকে চোখ পড়তে ফটিক শিউরে উঠ্‌ল। ওখানে পড়ে রয়েছে তার কাকাদের মৃতদেহ। কারোর হাত কাটা গেছে, কারো মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আবার কারো বা লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে রক্ত গঙ্গা বয়ে গেছে! কিন্তু কেউ বেঁচে নেই। হীম, অসার—শক্ত হয়ে গেছে মৃতদেহ গুলি। ওদের দেখ্‌তে পেয়ে গাছের ডালে বসা কতকগুলি কাক কা-কা শব্দে উড়ে পালিয়ে গেল!

মায়ের কিন্তু এ সবের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই। তার চোখ দুটি বুঝি পাথরের হয়ে গেছে! ফটিককে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মা কেবলি বল্‌ছেন, পালিয়ে আয় ফট্‌কে,—আমার সঙ্গে পালিয়ে আয়

কি করো ? ফটিক তাই সব কিছু ভাবনাকে ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চল্লো।

কিন্তু ও কিসের গোলমাল ?

সেই গুণ্ডার দল কি এখনো গ্রাম ছেড়ে চলে যায় নি ? তাদের হত্যা আর অগ্নিদাহের সর্ব্বনেশে উৎসব কি এখনো শেষ হয় নি ?

ফটিক মাঝ পথে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো।

ওর মায়ের কানে কিন্তু কোলাহলের শব্দ কিছু পৌঁছয় নি।

মা বল্লেন, আবার থামছিস্ কেন ? চল, চল, পালাই চল—নইলে তোকেও আমার কোল থেকে কেড়ে নেবে—

ফটিক কানটা খাড়া করে বল্লে, কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে না ? মা কিছু না শুনেই জবাব দিলে, ও কিছু নয়—রে— ; পালাই চল—

হঠাৎ তাদের উল্টো দিক থেকে একটা লোক ছুটে আস্‌ছে দেখা গেল।

কী সর্ব্বনাশ ! বিপদের কিছু নাকি ?

মা ভাবছে, ছেলেকে বাঁচাতে হবে,—আর ছেলে ভাব্‌ছে নিজের প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা করতে হবে।

এমন সময়ে দেখা গেল যে, আগন্তুক আর কেউ নয়,—ছায়েদ। সে বল্লে, আমি তোদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম ফটিক। শয়তানরা এখনো গাঁ আগলে রয়েছে। চল শাগ্‌গির আমার সঙ্গে। মাসিমা, পা চালিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাদের লুকিয়ে রাখ্‌বো—কাক, পক্ষীও জান্‌তে পারবে না।

আঠারো

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মা চলে এলো ফটিকের পেছন পেছন। সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে কেঁদেছে খুকুটা।

সে কখন ফটিকের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চোখের জলের দাগ গালের উপর চিক্-চিক্ করছে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। যে ছায়েদের সঙ্গে চিরটা কাল উঠেছে—বসেছে—এক সঙ্গে খেলা করেছে, খাবার নিয়ে কপট অভিমান জানিয়েছে- সে যেন এক রাত্তিরের ভেতর এত দূরে চলে গেছে—যে তার আর নাগাল পাওয়া যায় না!

ছায়েদ তার বাড়ীর পেছন দিককার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঢুক্‌ল—সাম্‌নের রাস্তাটা মাড়ালো না। আপন মনেই বিড় বিড় করে বল্লে, ওখানে ব্যাটাদের কেউ কেউ হয়ত হুঁকো টান্‌ছে; তুই আমার সঙ্গে এই দিক দিয়ে আয় ফটিক—

ফটিকের মুখে কোন বাক্যি নেই! তবু এই ছায়েদকে আশ্রয় করেই হয়ত সে তার মায়ের প্রাণ আর মান বাঁচাতে পারবে—নিজেও রক্ষা পাবে।

ধীরে ধীরে ছায়েদ ফণী-মনসার গাছ আর কামরাঙার বন পেরিয়ে ঢুক্‌লো ওদের গোয়াল ঘরগুলির পাশে। অনেকগুলি দুধোলো গাই ওদের। ছায়েদের বাবা ক্ষেত-খামারের সঙ্গে দুধের ব্যবসাও করে। সেই গাইগুলি সারে সারে থাকে এখানে।

ছায়েদ আপন মনেই বল্লে, তোদের এখানে খুবই অসুবিধে হবে ফটিক। কিন্তু এ ছাড়া তোদের বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই।

গুলোও বোধকরি এখনো হারিয়ে যায়নি। দরকার হলে বল্‌তেই হবে যে আমিই খুকুর মা। তুমি কিছু ভেবো না।

নিঃশব্দে ঘুমন্ত খুকুকে তুলে নিয়ে আমিনা বাড়ীর ভেতরের দিকে চ'লে গেল।

মা নির্ব্বাক হয়ে বসে সব কিছুই শুন্‌লে। কিন্তু কিছুই বল্লে না।

মা আর ছেলে চুপচাপ বসে রইল সেই খড়ের গাদার ওপর। গাছের পাতার একটা খস্‌খস্‌ শব্দ হলে দু জনেই চম্‌কে ওঠে। মা ভাবে, কি করে বুকের ধনকে বাঁচাবে; আর ছেলে মনে-মনে জ্বলে ওঠে, কি করে মায়ের সম্মান বজায় রাখ্‌বে?

রাত গভীর হতে থাকে।

দূরের বনে শেয়াল প্রহর ঘোষণা করে।

কিন্তু ছায়েদের বাড়ীর সাম্‌নেকার কোলাহল বন্ধ হয় না!

ফটিকের মনে হল, সারা পৃথিবীতে এমন একটি ঠাঁই নেই—যেখানে ওরা মা-পুত এক সঙ্গে বেঁচে থাক্‌তে পারে।

যে গুণ্ডার দল ক্রমাগত তাদের জন্যে দাবী জানাচ্ছে—তারা জীবনে ওদের কখনো দেখেনি; ওদের সঙ্গে কোনো শত্রুতাও তাদের নেই—তবু মানুষের রক্ত দেখ্‌বার এ কি হীন আকাঙ্খা মানুষের বুকে বাসা বেঁধে আছে? মানুষ কি কোনো দিনই প্রতিবেশীকে ভালো বাস্‌তে পারবেনা!

রাতের প্রহর বেড়ে চলে।

একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে।

এই নিস্তব্ধ রাত্রে অন্ধকার গোয়াল ঘরে বসে—জীবন আর মৃত্যুর সন্ধি স্থলে দাঁড়িয়ে ফটিকের কেবলি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কথা মনে পড়ছে!

কত আশার বাণী তারা শুনেছিল এই বুড়ো মানুষটির কাছে। তাদের দেশকে আবার বড় করে গড়ে তুল্‌বে, সবাই হাতে-হাত মিলিয়ে; কত আকাঙ্খা—কত পরিকল্পনা!—সব এক রাতের মধ্যে ছাই হয়ে গেল!

মানুষ আসলে কখনো খারাপ হয়?

ওই মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর এই ছায়েদ! তাদের মনের পরিচয় একবার যারা পেয়েছে তারা কি কখনো তাদের ভুলতে পারবে?

আজ এই মুহূর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয়বাবু কোথায়? তিনি বেঁচে আছেন কিনা তা ও ফটিক জানে না! ছায়েদকে জিজ্ঞেস্ করবার মতো সাহস তার নেই!

রাত যে এরই মধ্যে কত বেড়ে উঠেছে—ওরা কেউ বল্‌তে পারে না। মা শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বল্লে, তোর ত' রাত্তিরে পেটেও পড়ল না কিছু! আমিনা বোধকরি ভুলে গেছে।

ফটিক মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জবাব দিলে, আমাদের বাঁচাতে গিয়ে ওদের মাথার ওপরও ত' খাঁড়া ঝুল্‌ছে! এ সময় কি আর খাবারের কথা মনে হয় কারো?

ফটিকের কথা শেষ হয় নি—এমন সময় আমিনা মুড়ি, মুড়কি আর দুধ নিয়ে এসে হাজির হল।

মা একটু লজ্জা পেল। এই নির্ব্বাক নতমুখী মেয়েটি কি ভাবে তাদের রক্ষা করবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে—ভাব্‌লে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

ফটিক কোনো কথা না বলে আমিনার হাত থেকে সান্‌কিটা তুলে নিয়ে খেতে বসে গেল।

আমার দেহে খুব জোর আছে। খুকুকে নৌকার ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে আমার কোনই অসুবিধে হবে না। অতি ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে দুধের কলসী বয়ে নিয়েছি। মাঠ থেকে ধান আঁটি বেঁধে এনেছি এত যে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তার তুলনায় খুকু ত' সোলার মতো হাল্‌কা রে!

ফটিক আর কোনো আপত্তির কথা তুলতে পারল না। সত্যিকথা বল্‌তে কি ফটিকের সাধ্যি ছিল না যে, খুকুকে কোলে নিয়ে সে এতটা পথ হাঁটে! কিন্তু পথে বেরিয়ে মা যে একেবারে চুপ করে গেলেন,—আর একটি কথাও তার মুখ থেকে বেরুল না! সে একেবার মায়ের মুখের দিকে তাকালে। সে মুখ এত নির্লিপ্ত আর উদাসীন যেন মনে হল, মা যে কোথায় ছিলেন—কোথায় যাচ্ছেন কিছুই তার মনের মধ্যে নেই। মা যে সারা জীবনের মতো গাঁয়ের মায়া ছেড়ে হারা উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়িয়েছেন একথা কি তার মনে একবারও জাগছে না!

অতি বড় দুঃখের দিনে মানুষের যখন কিছু যায় কিছু হাতে থাকে তখন সে বসে হিসেব করতে পারে যে, তার কি খরচ হল—আর জমার ঘরেই বা কি রইল! কিন্তু যে ভবের হাটে বিকিকিনি করতে এসে দেখে যে, সব কিছুই সে হারিয়ে বসে আছে তখন হিসেব করবে সে কি দিয়ে!

মা হয়ত সেই সব হিসেব-নিকেশের পালা শেষ করে ফর্দ্দ হাতে নিয়ে হাট শেষে—ফিরে যাচ্ছেন—কোথায় তাও তিনি জান্‌তে চান না!

এই ভাবনা চিন্তার মাঝখান দিয়ে ওরা অনেকখানি পথ চলে এলো।

আবার পথে বাঁকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ।

ছায়েদ সবাইকে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড় করিয়ে বল্লে, ফটিক দাঁড়া ভাই। আমরা যে পথ ধরে এগুবো—গোলমালটা সেই পথের ওপরেই হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি! তুই এইবার বরং খুকুকে কোলে নিয়ে বসে একটু জিরিয়ে নে।

দ্রুতপদে ছায়েদ চলে গেল—গোলমালটা যেদিকে হচ্ছে সেই দিকেই।

মা ঘাসের ওপরে বসলেন। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল যে, সারা জীবনেও যদি কেউ তাকে এখান থেকে উঠ্‌তে না বলে তাহলেও তার দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণ থাক্‌বে না।

ছায়েদের কিন্তু ব্যস্ততার সীমা নেই।

সে ছুটে গিয়েছে—আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তেই ফিরে এসেছে।

বল্লে, পথের ওপরই একটা বাড়ী ওরা লুট করেছে। এখান দিয়ে আমাদের যাওয়া চল্‌বে না। লুট শেষ হয়ে গেলেই বোধকরি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

ফটিক অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলে, কি উপায় হবে ভাই ছায়েদ? খুকু আর মাকে নিয়ে আমি তাহলে যাই কোথায়?

ছায়েদ লাফিয়ে উঠে জবাব দিলে, ঠিক কথা! মনে পড়েছে! আমাদের এই ডানদিকের জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ আছে। দিনের বেলা অনেক সময় রাখাল ছেলেরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার জন্যে ওই পথ দিয়ে গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসে। সেই পথ ধরেই এবার আমাদের এগুতে হবে। আর ভাব্‌বার সময় নেই; ফটিক, ওঠ,—খুকুকে আমার কাছে দে—

ছোটখাটো হাটের সৃষ্টি হয়েছে। দূর-দূর যায়গা থেকে সাপে-কাটা মানুষকে এখানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।

মন্দিরের যিনি পুরোহিত তিনি এ অঞ্চলের একজন নাম করা ওঝা! বহু স্ত্রী-পুরুষকে তিনি মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। সাপকে জব্দ করবার আসল অষুধ তাঁর জানা আছে এই কথা চারিদিকের সাতটা গাঁয়ের লোক জানে।

এই মনসা ঘাটে প্রত্যহ বহু নৌকো এসে লাগে।

পারাপারের নৌকো, ব্যাপারীর নৌকো, জমিদারের বজ্‌রা, নৌকো বাচের ছিপ্, ছোট ছোট নৌকো—যার নাম কোশা—এম্‌নি বহুজাতীয় নৌকোর সমাবেশ হয় এখানে।

ফটিক ভয়ে ভয়ে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। নৌকো-গুলো পাশাপাশি যেন নদীর কোলে ঘুমিয়ে আছে। এখন যাত্রীর চ্যাঁচামেচি নেই, নেই ব্যাপারীদের ভীড় আর নৌকো বাচের সোল্লাস ধ্বনি! সব যেন রূপোর কাঠির পরশ পেয়ে নিঝুম হয়ে আছে।

ছায়েদ বল্লে, আয় ফটিক আমার পেছন-পেছন। এই ফাঁকে একটি নৌকোয় তোদের তুলে দেবোই।

আরো কিছুটা পা চালিয়ে গিয়ে ঘাটের কিনারায় এসে খুশী মনে ছায়েদ বল্লে, এইবার আর ভাবনা-চিন্তা নেই। আসল ওষুধ পাওয়া গেছে—

ফটিক শুধোলে, আসলে ওষুধটা কি শুনি?

ছায়েদ আঙুল দিয়ে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলে, দেখ্‌ছিস্ নে? বসির মিঞার ডিঙি ঘাটে বাঁধা রয়েছে! এইবার ঠিক মুস্কিল-আসান হয়ে যাবে।

ফটিক চেয়ে দেখ্‌লে হ্যাঁ, বসির মিঞারই নৌকা বটে।

এ সেই বসির মিঞা যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর উঠোনে ওদের লাঠি খেলা আর কুস্তি শেখাতো। সে হিন্দু না—মুসলমান—একথা একবারও মনে জাগে না। সবাই জানে সে বসির মিঞা, সবাইকার আপন জন, ছেলেদের ত' দোস্ত্‌—

ছায়েদ হাঁক্ দিলে, বসির মিঞা নায়ে আছো—

কোনো জবাব না দিয়ে হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে বসির মিঞা ছইয়ের তলা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ওদের দেখে চিন্‌তে পারলে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে উত্তর কর্‌লে, আস্তে কথা ক' ছায়েদ। ফট্‌কেরে নিয়ে এলি বুঝি? তারপর ফটিকের মায়ের দিকে চোখ পড়তে বল্লে, এসো মাঠান, নায়ে উঠে এসো—ছৈয়ের তলায় চলে যাও। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার ভরসা কি? আশে-পাশে মন্দ মানুষ মেলা ঘাপটি মেরে আছে।

ফটিকেরা সবাই মিলে নিঃশব্দে নৌকোয় উঠে ছইয়ের ভেতরে গিয়ে যখন বস্‌ল—তখন তাদের মনে হল—কেটে ফেল্লেও আর তাদের ওঠবার ক্ষমতা নেই।

ছায়দের চোখে এইবার জল দেখা দিয়েছে। বল্লে, তোমারে কিছু কওনের নাই বসির মিঞা—ওদের তুমি দেখো—

বসির চাপা গলায় জবাব দিলে, তুই আর কি কইবি রে ছায়েদ—সেদিনের দুধের পোলা। আমি এই দু'দিন চোখের ওপর যা' দেখ্‌লাম—তাতে পাগল হয়ে না যাই! কত হিন্দু পরিবারকে যে আমি এই নৌকায় করে ইষ্টিমারে উঠিয়ে দিয়েছি—সে কথা এখন গুণে বল্‌তে পারবো না। তবে যত মেয়েছেলেকে বাঁচাতে পেরেছি তার

শুধু বল্লে, না বসির, আমি বেশ আছি। তুমি কেবল আমার ছেলে-মেয়েকে বাঁচিয়ে দাও—।

বকের মতো পাখা মেলে বসিরের ডিঙ্গি নৌকো যেন উড়ে চলে।

বসির মিঞা হাল ধরে বসে আছে বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি সব দিকে ঘুরে আস্‌ছে।

অনেক মরা ভেসে যাচ্ছে নদীর জলে। ফটিকে ঝুঁকে সেগুলি দেখতে যাচ্ছিল। বসির তাকে ধম্‌ক দিয়ে বল্লে, আবার ওদিকে ঝুঁক্‌ছিস্‌ কেন? বসে থাক্‌ আমার কাছে। এদিক-সেদিক করলে আমি কিন্তু আর কোনো গল্প করবো না!

ধমক খেয়ে ফটিক আবার চুপচাপ বসে পড়ে। কিন্তু এক মহূর্তের মধ্যে নদীর জলে যে মরাটা সে দেখেছে—তার কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না! ছোট্ট ছেলে। ঢলঢলে মুখখানি! কোঁক্‌ড়া-কোঁক্‌ড়া কি সুন্দর কালো চুল! লাঠির ঘায়ে বোধ করি মাথাটা দু'খানা করে ভেঙে দিয়েছে। রক্তে নদীর জল একেবারে রাঙা হয়ে গেছে। ওদিকে চোখ পড়লেই গা শিউরে ওঠে! অমন সুন্দর ছেলের মাথায় যে লাঠি মেরেছে তার মনটা কি দিয়ে গড়া ফটিক আপন মনে ভাবতে চেষ্টা করে। এই ত' তার পাশেই বসে রয়েছে বসির মিঞা। সে-ও ত' মুসলমান। কিন্তু সে কথা ত' একবারও মনে হয় না।

শুধু মনে হয় একটা মানুষের কাছে বসে আছে ফটিক।

হঠাৎ দূরে একটা নৌকো দেখে বসির মিঞা চঞ্চল হয়ে উঠল। ফটিককে কানে-কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লে, ওরে একবার ছইয়ের ভেতরে সেঁধিয়ে মায়ের পাশটিতে শুয়ে পড় ত!

বসির মাথা নেড়ে বল্লে, নিজের মেয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার আর গোলমাল কি মিঞা? না হয় আমার সঙ্গে তোমরাও কুটুম বাড়ী চলো না—

লোকগুলি এক সঙ্গে দাঁত বের করে হো-হো শব্দে হেসে উঠল। তারপর হাতের ইশারায় নৌকোর ওপরে রাখা লুটের মালগুলি দেখিয়ে দিয়ে জবাব দিলে, না মিঞা, তোমার কুটুম বাড়ী যাবার সময় আমাদের নেই। তবে পথে যদি খোরাক পাও—তবে হাঁক-ডাক করে আমাদের খবর দিও—

—তা দেবো বৈ কি! আমিও ত' সেই পথেরই পথিক! বসির মিঞা তাদের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে।

ষণ্ডা লোকগুলো হো-হো করে হাস্‌তে হাস্‌তে অন্য এক দিকে নতুন শিকারের সন্ধানে চলে যায়!

মা শুয়ে শুয়ে সব কিছুই শুনতে পাচ্ছে। কথা বলার কিম্বা ভয় পাবার পর্ব্ব যেন তার জীবন থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছে! প্রাণ ত' মহাকালের পায়ে অঞ্জলি দেয়াই আছে। তবু মৃতু-সায়রের পারে দাঁড়িয়েও তুটি ক্ষুদ-কুড়োর জন্যে নিজের জীবনের এতখানি মমতা।

নৌকোটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে ফটিক ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ বসিরের পাশে এসে বস্‌লো। বসির মিঞার মুখ দিয়েও সহসা কোনো কথা বেরুলো না। সে শুধু ফটিকে পরম আগ্রহে নিজের বুকে টেনে নিলে। এই বুড়ো মুসলমানটি যেন তাকে নিজের কলিজার ভেতর লুকিয়ে রাখতে চায়!

ক্রমে রৌদ্রের তাপ কড়া হতে লাগ্‌লো।

ফটিক আর খুকু চিড়ে-গুড় খেয়েছে বটে—তবু নদীর হাওয়ায় পেটের ক্ষিদে যেন চার পা তুলে ঘোড়ার মতো লাফাতে সুরু করে দিলে।

খুকু এতক্ষণ চুপচাপ মায়ের পাশটিতে শুয়ে ছিল। তার এই ছোট্ট জীবনে সময় মতো মাছ-ভাত খাওয়া একেবারে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রথমে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে। ওদের বাড়ী সব সময় রম্-রম্—গম্-গম্ করতো। কিন্তু এই রকম মারামারি—আগুন, চোরের মতো পালিয়ে বেড়ানো—ওর কাছে একেবারে নতুন। তাই হাসিখুসী মেয়েটা দু' দিনের মধ্যে যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে! না পারে কিছু বুঝতে, না পারে কিছু কইতে!

তবু ওইটুকু দুধের শিশু ক্ষিদে কি করে সইবে?

ক্ষীণকণ্ঠে মাকে বল্লে, ক্ষিদে পেয়েছে মা, মাছ-ভাত খাবো—

বসির মিঞা কপালে এক চাপড় মেরে বল্লে, আহা বাছারে! জন্ম ইস্তক ওরা মাছ-ভাত খেয়ে মানুষ···আজ একেবারে আচম্‌কা অকুল পাথারে পড়ে গেছে। আল্লার যে কি মর্জ্জি তা সেই জানে!

মা কখনো ছেলে-পুলের ক্ষিদে সইতে পারেন না। কিন্তু আজ তিনি তাঁর মনকে পাষাণে বেঁধে ফেলেছেন। খুকুর মুখ থেকে ক্ষিদের কথা শুনেও চুপ করে মরার মতো পড়ে রইলেন। পাছে তার মুখের দিকে চাইলে চোখে জল আসে—তাই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ফটিক শুধু ফিস্ ফিস্ করে ওকে শুধোলে, খুকু, আর একটু চিড়ে খাবি? ভারী সুন্দর লাগে গুড় দিয়ে খেতে—

এক মুহূর্ত্ত আগে এই বসিরকেই মা সন্দেহ করে বসেছিলেন। দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষার মাঝখান দিয়ে চল্‌তে গেলে মানুষের মন সবাইকে এত বেশী সন্দেহ করে বসে যে,—অতি বড় হিতাকাঙ্ক্ষীকেও শত্রু বলে ভাবতে তার আটকায় না!

সত্যি, বসিরকে সন্দেহ করে মা মনে মনে পাপ সঞ্চয় করলেন।

নিজের মনকে নিজে শাসন করে মা এই সব রান্না-বান্নার ব্যাপারে আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বসির নৌকো বেঁধে তীরে লাফিয়ে পড়েছে। শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে ফটিককে বল্লে, ওরে, নৌকো ছেড়ে কোথায়ও যাস্‌নে যেন ফট্‌কে। আমি যাবো আর আস্‌বো।

ফটিক একবার ভেবেছিল বসির মিঞার সঙ্গে সে-ও যাবে। কিন্তু হাট আর আগেকার দিনের হাট নেই, আর তা' ছাড়া মা আর খুকু অসহায়ের মতো নৌকোয় পড়ে থাক্‌বে এই কথা মনে হতে সে চুপচাপ বসে রইল—আর কোনো প্রতিবাদই করল না।

যায়গাটাকে নিরিবিলিই বল্‌তে হবে।

বেশ খানিকটা পরিষ্কার তক্‌তকে যায়গা। যেন প্রকৃতি ঠাকুরুণ নিজে ঝাঁট দিয়ে, ন্যাতা বুলিয়া সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছেন। হাত পা ধুয়ে রান্না চাপিয়ে দিলেই হল।

চারদিকের ঘন ঝোপ এমনভাবে যায়গাটাকে আড়াল করে রেখেছে যে মনে হয়—যে রামপ্রসাদের মতো কোনো সাধক বুঝি আপন মনে মায়ের গান গাইতে গাইতে নিপুণভাবে বেড়া বেঁধে রেখে গেছে।

স্থানটি সত্যি মনকে টানে।

আবার বসির মিঞার ডিঙ্গি নৌকো মোচার খোলার মত গাঙের বুকে ভেসে চলে। কেউ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে—কেউ দেখে না।

সূয্যিমামা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে এক দিকে যেমন চলেছে হোলি খেলা—তেমনি গগনের কোনের মেঘের মধ্যে চলেছে রঙের মাতামাতি !

কিন্তু অলস চিন্তায় সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্নের জাল বোনার অবকাশ আজ এই ডিঙির আরোহীদের কারো নেই !

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে। গাঙ-চিলেরা যে যার বাসার খোঁজ করে। মা সেই দিকে তাকিয়ে ফটিক আর খুকুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাবে আজ ওদের মাথা গোজবার ঠাঁই টুকু নেই ! পশুপাখী, কীট পতঙ্গ সবাকারই আছে বাসা। সন্ধ্যে হলে তারা নীড়ের মায়ায় ফিরে আসে ; কিন্তু তার ছেলে-মেয়ে দুটি সোতের সেওলার মতো কোথায় ভেসে চল্লো, সদ্য ওঠা শুকতারার দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করেও তার কোনো জবাব মিল্‌লো না।

নদীর দুধারে ধীরে ধীরে যেন দীপান্বিতার আলো ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু সেই অজস্র আলোর একটিও তাদের আহ্বান জানিয়ে বল্‌ল না, —ওরে, তোরা এই ঘাটে এসে নৌকো ভিড়িয়ে নে ; এখানে তোদের মিল্‌বে রাত্রের আশ্রয়, ক্ষুধা নিবারণের অন্ন আর নিরাপত্তার আশ্বাস।

এত মানুষের এত স্নেহের নীড়···কিন্তু ওরা কোন পাপে এমন করে অন্ধকারের পথে চিরকাল ধরে চলবে হারিয়ে যাওয়ার স্রোতে ?

মানুষকে ওরা ভালো বেসেছিল ; তাই কি এই পুরস্কার ?

তফন ঘাড় ফিরিয়ে বসিরকে চিন্তে পারলে।

ইতিমধ্যে একটা লোক মশাল জ্বালিয়ে ফেলেছে। তখন আর কোন কিছুই গোপন করা গেল না।

তফন রসিকতা করে বল্লে, আরে মিঞা, ডাকাতি আমি করবো কেন? ডাকাতি করছ তুমি। সোনা-দানা টাকা কড়ি দিয়ে হিঁদুদের পাঠিয়ে দিচ্ছ বাইরে। ও সব সম্পত্তি ত' আমাদের পাওনা। বেইমানী করে তোমার কি লাভটা হচ্ছে ভাই দোস্ত? তুমি বরঞ্চ আমাদের হাতে হাত মেলাও—যা জোটে তার ভাগ নাও।

বসির তফনকে কাছে ডেকে বসালে। বল্লে, দোস্ত্, তামাক খাও। তফন খুশী হলো। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্তে লাগ্লো নায়ের পাছা গলুইয়ে বসে। বসিরের দেখে শুনে মনে হল তফনই দলের দলপতি। কেন না সে বসে বসে হুকুম করছে—আর সেই হুকুম তামিল করবার জন্যে রয়েছে বহুলোক।

বসির বুঝ্লে, তামাকের নেশাটা বেশ ধরেছে। আর হবেই বা না কেন। সারাদিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করলে দেহ এলিয়ে যায়। তখন আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লে। বল্লে, দোস্ত, এক দুঃখী হিঁদু পরিবারকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আমার দুদ্দিনে ওরা উপোসের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছে। তুমি আমার দোস্ত্। তাই তোমার দুটি হাত ধরে বল্‌ছি ওদের প্রাণে মেরোনা। টাকাকড়ি যদি কিছু থাকে নিয়ে নাও তুমি, আমি আপত্তি করবো না।

হুঁকোয় একটা জোর টান দিয়ে তফন মিঞা জবাব দিলে, আচ্ছা ভাই দোস্ত্। এক সঙ্গে ছেলে বেলায় একই ওস্তাদের কাছে লাঠি ঘুরিয়েছি—তোমার কথা আমি রাখবো। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বল্লে,

ওরে, তোরা থাম্। এ আমার পুরোনো দোস্ত। ওর নৌকোয় কোন ঝামেলা আমি করবো না। তারপর নৌকার ভেতরের মানুষগুলিকে উদ্দেশ করে কইলে, ওগো ভালো মানুষের মেয়ে,— টাকাকড়ি যা আছে বাইরে ফেলে দাও—আমরা মানে মানে সরে পড়ছি।

ফটিক হাত বাড়িয়ে একশ' টাকার নোটের বাণ্ডিলটা এগিয়ে দিলে

জন্যে যে হুড়োহুড়ি আর মারামারি সুরু হয়ে গেল—তাতে সবাইকার মনে এই ভয় জাগ্‌ল যে, গোটা ষ্টীমারটাই না শেষ পর্য্যন্ত নদীর অতল জলে তলিয়ে যায়!

বসির মিঞা এতক্ষণ ধরে যাত্রীদের এই কাণ্ড দেখছিল। সে এইবার বল্লে দেখ্ ফটিক ভাই, জমি দিয়ে গেলে আজ কিছুতেই ইষ্টিমারে তোরা উঠ্‌তে পারবিনে। আমি আমার ডিঙি নিয়ে ইষ্টিমারের পেছন দিকে চলে যাচ্ছি—সেইখান থেকে তোদের কাছি ধরে উঠ্‌তে হবে। নইলে এই জন-মানুষ-শুন্যি চরে তোদের আমি কিছুতেই ধরে রাখ্‌তে চাইনে। কখন যে কী বিপদ হবে কেউ বলতে পারে না!

বসির তার কথা মত ডিঙিটাকে নিয়ে আড়ালে আড়ালে ইষ্টিমারের পেছন দিকে নিয়ে হাজির করালে। বসির বল্লে, মা-ঠাকরুণ, তুমি আগে কাছি ধরে কষ্ট করে উঠে পড়ো। তারপর খুকুকে আমি উঁচু করে ধরবো—তুমি কোলে তুলে নেবে! ফটিকের জন্যে আমি কিচ্ছু ভাবিনে।

ফটিক আর বসিরের সাহায্যে মাকে অনেক কষ্টে ওপরে ঠেলে তুলে দেয়া হল। ঘুমন্ত খুকুকে এইবার বসির উঁচু করে ধরলে। মা দুদিন কিছু খায় নি। তার হাত কাঁপতে লাগ্‌লো। ছোটরা ঘুমিয়ে পড়লে ভারী হয় বেশী। মার হাত থেকে খুকু হঠাৎ ফস্কে পড়ে যাচ্ছিল—এমন সময় ষ্টীমারের একটি জোয়ান যুবক চট্ করে ছুটে এসে খুকুকে ধরে ফেল্লে। নইলে সে নিশ্চয়ই নদীর জলে পড়ে যেত! ওদিকে ষ্টীমার ভেঁপু বাজিয়ে দিয়েছে। বসির তাড়াতাড়ি

জলের ফ্যানা—অন্ধকারের ভেতর মাঝে মাঝে চিক্ চিক্ করে উঠ্ছে। কোন অসীম শূন্যে একটা গাঙ্ চিল হয়ত তার সাথীকে হারিয়ে করুণ কণ্ঠে চীৎকার করছে—বাসায় ফিরতে তার মন চাইছে না। তাই বুঝি নিশীথ রাতের অন্ধকারে কেঁদে কেঁদে ফিরছে।

ষ্টীমারের চলাচলের সময় লোহার ভারী শেকলটা থেকে থেকে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে। সেই শব্দ শুনে ফটিকের কেবলি মনে হচ্ছে—অনেক অসহায় মানুষের পায়ে বেড়ি দিয়ে বুঝি তাদের অন্ধ কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

মা চোখ বুঁজে এক কোণে পড়ে আছে। ঘুমিয়েছে কিনা দেখে বোঝবার যো নেই। খুকু সেই দুধ মিষ্টি খেয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকালে ভয় হয়! সে সত্যি বেঁচে আছে কিনা এই সন্দেহ মনে জাগে।

ঘুম নেই জোয়ান দাদা আর ফটিকের চোখে।

ওরা দু'জনে শুধু এপাশ-ওপাশ করছে।

জোয়ান দাদা এক সময় ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ফট্‌কে, এই ফাঁকে খানিকটা ঘুমিয়ে নে। নইলে শেষ রাত্তির থেকে আবার হল্লা সুরু হবে। ষ্টীমারে মাছ চালান দেবে একটা ষ্টেশনে।

আবদারের সুরে ফটিক জবাব দিলে, ঘুম যে কিছুতেই আস্‌ছে না দাদা, মনে হচ্ছে—চোখের ভেতর কে যেন লঙ্কার গুড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে।

জোয়ান দাদা আর কিছু বলেনি, চুপচাপ মরার মতো পড়ে আছে। ষ্টীমারের ওপর আস্তে আস্তে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল—তখন আর একদল নিশাচর লোকের কাজ সুরু হয়ে গেল।

ষ্টীমার শুদ্ধ্ লোক একেবারে নিঝুম হয়ে পড়েছে। শুধু ইঞ্জিনের ধুক্‌পুকুনিটা ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। কেউ ভয়ে টু শব্দটি পর্য্যন্ত করছে না—পাছে তার কপালেও এই জাতীয় কোনো বিপদ ঘটে!

মা চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে ভাবছে,—অকুল পাথারে সবাই শুধু হাবুডুবু খাচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে—নিঃশ্বাস নেবার অবকাশটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না! দম আট্‌কে যাচ্ছে ধীরে ধীরে;—এইবার শীতল জলের একটা স্রোত কপালের ওপর দিয়ে যেন বয়ে চলেছে। মাথার সমস্ত যন্ত্রণার বুঝি এখন অবসান হবে। মা হাত বাড়াল নিজের ডাইনে বাঁয়ে! কোলের ছেলে মেয়ে দুটি বুঝি ঢেউয়ে ভেসে গেছে! কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো খুঁজে বেড়াতে লাগলো ওদের দুটিকে। কিন্তু কোন্ স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেছে তারা—কে হদিশ দেবে?

একটা দারুণ কোলাহলে মায়ের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। যাত্রীদের মধ্যে কোলাহল আর উত্তেজনা দেখা দিয়েছে কেন?

কয়েকটি উৎসাহী তরুণ খবর নিয়ে এসে বল্লে, সারেঙ আর খালাসীদের মধ্যে লোভ আর হিংসার প্রবৃত্তি আসুরিকভাবে জেগে উঠেছে! তারা মাঝ দরিয়ায় সবার অজান্তে ষ্টীমার নোঙর করেছে। বল্‌ছে, যার কাছে যা' আছে সব দিয়ে দাও। নইলে দা' দিয়ে কুপিয়ে মারবো, লাঠি দিয়ে মাথা ফাটাবো, আর না হয়—গন্‌গনে বয়লারে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

মা আঁৎকে উঠে বল্লে, তাহলে উপায়? আমার ছেলে-মেয়েকে আমি কি করে বাঁচাবো?

জোয়ান দাদা জবাব দিলে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না মা! সবাই ত'

এক-একটা নৃশংস অত্যাচার মা চোখে দেখে আর তার বুকের মধ্যে কাঁপুনি লাগে !

নিজের গ্রামের দুর্গাপূজার সময়কার পাঁটা বলির কথা তার মনে হতে লাগ্‌লো। সারা গ্রাম বলির রক্তে লাল হয়ে ওঠে। আজ এই অভিশপ্ত রাত্রে কত নিরীহ প্রাণীর রক্তে যে ষ্টীমারের ডেক্ ভেসে গেল কে তার হিসেব রাখ্‌বে !

ষণ্ডা-ষণ্ডা খালাসীরা আগে মৃতদেহগুলি ধরাধরি করে ঝপাং ঝপাং নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগ্‌লো। রক্তে তাদের দেহও লাল হয়ে উঠেছে। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল,—দয়া মায়া প্রীতি বলে কোনো সুকুমার বৃত্তি ওদের হৃদয়ে নেই ! ওরা কোনো মায়ের কোলে মানুষ হয়নি, কোনো স্নেহের নীড় তাদের নেই, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ এই পিশাচদের নেই যারা মানুষকে আপনার বলে ভালোবাস্‌তে পারে !

দুর্দ্দান্ত খালাসীর দল তারপর বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢেলে গোটা ষ্টীমারটাকে ধুয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কোনো চিহ্ন তারা ডেকের ওপর রাখ্‌তে চায় না। রক্তের দুর্গন্ধে মায়ের বমির উপক্রম হতে লাগলো।

মাথাটা ঘুরতে লাগ্‌লো। মনে হল পায়ের নীচে কোনো নির্ভর নেই !

টলে গিয়ে মা সেই স্বল্প সরিসর যায়গার মধ্যেই মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল !

তেইশ

ফটিক কিন্তু চুপ্‌চাপ বসে নেই।

মা জ্ঞান হারিয়েছে।

সাময়িকভাবে সে জ্ঞান ফিরে না আসুক তাকে শুভ-লক্ষণ বলেই ধরে নেয়া যাবে। খুকুটাও ক্লান্তিতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছে যে ওর দেহে প্রাণ নেই।

নাকের কাছে আঙুল ধরলে ক্ষীণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

ফটিক একবার ভাবলে যে, পায়খানা থেকে বেরিয়ে কলে কোঁচাটা ভিজিয়ে এনে সেই জল মায়ের মুখে ঝাপ্‌টা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌বে। কিন্তু কাজটাতে বিপদ আছে পদে-পদে।

ষণ্ডা খালাসীর দল রক্তের স্বাদ পেয়ে একেবারে মূর্ত্তিমান যমদূত হয়ে বসে আছে। দাঙ্গা আর রক্তারক্তির কোনো সাক্ষী-প্রমাণই ওরা জিয়িয়ে রাখতে চাইবে না! যদি কোনো রকমে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারে যে, ওদের তিনটি প্রাণ ধুক্‌পুক্ করে এখনো বেঁচে আছে তবে ডাণ্ডার চোটে একেবার ঠাণ্ডা হয়ে যেতে খুব বেশী দেরী হবে না!

কাজেই মায়ের চেতনার জন্যে খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। হয়ত জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ যাবে। তার চাইতে আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে সময় নেয়া ভালো।

ফটিক সেই কাঠের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

খালাসীদের ভেতর এইবার উন্মাদনাটা অনেক কমে এসেছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মা বড় বড় চোখে ইতি-উতি চায়।

ফিসফিস্ করে শুধোলে, রাক্ষসগুলো কি সরেছে রে ফট্‌কে ?

ফটিক মায়ের কানে-কানে জবাব দিলে, তাইত মনে হচ্ছে মা! সারারাত গুণ্ডামি করে এইবেলা ভোঁস্-ভোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে!

তাহলে আর দেরী নয়—খুকুকে নিয়ে পালাই চল।

মার কণ্ঠে দারুণ উৎকণ্ঠা।

ফটিক বল্লে, আমিও সেই কথা ভাবছিলুম মা!

—আর ভাবাভাবির কি আছে ? চল্, উঠে পড়ি—মা এই কথা বল্‌তে বল্‌তে কাঠের পার্টিশনটা ধরে মনের জোরে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। ফটিকও আর কোনোমতে দেরী করতে চায়না। সে-ও নিঃশব্দে খুকুকে কোলে তুলে নেয়।

আঁধার রাতের নিশাচরের মতোই দু'জনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে।

জঙ্গলের পাশে ষ্টীমারটা ভেড়ানো আছে। আগেকার দিন হলে এই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আস্‌ত। কিন্তু আজ লোকালয়ের মানুষদের পরিচয় ওরা পেয়েছে। তাই ওদের মনে জাগ্‌ছে একটি প্রবাদ—

"আপনার চাইতে পর ভালো—
পরের চাইতে বন ভালো।"

মানুষের মাঝখানে কুটির বেঁধেই ত' পরম আনন্দে প্রতিবেশী নিয়ে ওরা বাস করছিল। সেই প্রতিবেশীর মনের পরিচয় আজ তারা পেয়েছে। তাই ভাবছে,—লোকালয়ে যে আত্মীয়তা তারা পায়নি

কোনো প্রতিবেশী নেই বলে বোধ করি ওরা নিরাপদেই আছে। আবার আমাদের দেখে ভয় পেয়ে না যায়!

হঠাৎ একটি কুটিরের ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এলো এক বুড়ো আর তার সঙ্গে আধ বয়েসী একটি মহিলা।

জুটিয়ে নেবো! তোমাকে আর খুকুকে ত' আমিই খাওয়াবো-পরাবো।

বুড়ো ফটিকের কথা শুনে ফোক্‌লা দাঁতে হাস্‌তে থাকে, বলে, এমন চাকুরে ছেলে থাক্‌তে তোমার ভাব্‌না কি মা!

মায়ের চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে।

সেইদিনই বিকেলবেলা মা ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বনের আশ্রয়দাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা ষ্টেশনের পথে পা চালিয়ে দেয়।

চব্বিশ

পথটা নির্জ্জন।

লোকজন এক রকম চলে না বল্লেই হয়। মাঝে মাঝে দু'একটি রাখাল বালককে গরুর পাল নিয়ে অলস-মন্থর গতিতে যেতে দেখা যায়।

ফটিক শুধোলে, আচ্ছা মা, কল্‌কাতা যাওয়ার গাড়ী ক'টায় ছাড়ে তা'ত কিছু শুধোলে না?

মা জবাব দিলেন, সন্ধ্যের পর গাড়ী। ইষ্টিশনে গেলেই সব কথা জান্‌তে পারা যাবে।

খুকু তার মাথা নেড়ে পাকা গিন্নির মতো কইলে, আমায় কিন্তু আবার কোলে উঠ্‌তে বোলো না। এখন বড় হয়েছি আর কি কারো কোলে চড়া ভালো দেখায়?

মা মৃদু হেসে জবাব দিলেন, বেশ, তুমি হেঁটেই চলো, সেই

বসে থেকে থেকে প্ল্যাটফর্ম্মের চতুর্দ্দিকে যায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল একেবারে খোলা আকাশ তলে এলো-পাথাড়ি শুয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

বুড়ো দাদু আর মায়ের কথাবার্ত্তাও ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এলো। এরা নিজের নিজের দুঃখের পাঁচালী পরস্পরকে শুনিয়ে যেন সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সময় আর কাট্‌তে চায় না। প্ল্যাটফর্ম্মের ওধারের একটি ডোবায় একটানা ব্যাঙ ডেকে চলেছে। আর ঝোপে-ঝাড়ে বন-বাদাড়ে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঐক্যতান-বাদনেরও কামাই নেই। এমন সময় প্রেতের মতো একটি টিকিট চেকার বুড়ো দাদুর পেছনে এসে দাঁড়ালো।

ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লে, কল্‌কাতার গাড়ী আস্‌ছে আর আধঘণ্টা পরেই, ভীড় দেখ্‌ছেন ত? সাত দিন হয়ত এই প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে থাক্‌তে হবে। যদি উঠ্‌তে চান তবে নিরিবিলি আমার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলুন। বুড়ো দাদু ব্যবসায়ী লোক। চিরকাল লোক চরিয়ে এসেছেন।

মুখ খুল্‌তেই তিনি মনের কথা বুঝ্‌তে পারেন।

ঘাড় নেড়ে তিনিও চাপা গলায় জবাব দিলেন, রাজি আছি… কিন্তু আমাদের এই চারটি প্রাণীকে তুলে দিতে হবে।

আরো খানিকক্ষণ ধরে দু'জনের কি সব গোপন কথা হল। মা বুঝ্‌তে পারলেন যে, ইতিমধ্যে কয়েকটি নোট বুড়ো দাদুর ট্যাঁক থেকে টিকিট চেকারের প্যাণ্টের পকেটে চলে গেছে।

বুড়ো এইবার নিশ্চিন্ত মনে নিজের ছোট হুঁকো সাজিয়ে—গুড়ুক গুড়ুক তামাক টান্‌তে লাগ্‌লেন।

অবশেষে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে করতে যন্ত্র-দানব এক সময়ে ঠিক এসে হাজির হল। তখন লোকজনের চীৎকার, ছেলেমেয়ের কান্না, হারানো মানুষের ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতে কান পাতে কার সাধ্যি!

টিকিট কালেক্টরটি প্যান্টের পকেটে টাকা গুঁজেছিল বটে তবে সে তার কথা রেখেছে।

একটা চাবি দেয়া মধ্যমশ্রেণীর কামরা খুলে কোনো রকমে ঠেসে-ঠুসে চার জনকে সে জীবন্মৃত অবস্থায় তুলে দিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। তার তখনকার মুখের ভাব দেখে মনে হল বুঝি এইমাত্র সে ওয়াটার্লু যুদ্ধ জয় করেছে!

গাড়ীর ভেতরে তখন বুড়ো দাদু আর মা খুকু ও ফটিককে নিয়ে খাবি খাচ্ছেন বল্লেও বেশী বাড়িয়ে বলা হয় না। তার ওপর আশে পাশে ডাইনে-বাঁয়ে ক্রমাগত বাক্স, প্যাঁট্‌রা, বিছানা, ঝুড়ি, হাঁড়ি-কুঁড়ি এসে পড়ছে—ঠিক ভাদ্র মাসে গাছ থেকে তাল পড়ার মতো।

এই অসম্ভব ঠাসাঠাসির মধ্যেও আবার টিকিট দেখাবার পালা আছে। অনেককেই গাড়ী থেকে আবার নেমে যেতে হল সার্চ্চ করার পালা চুকিয়ে দিতে। তাদের আগেকার চেনা টিকিট চেকারটি আর একটি দশ টাকার নোটের বিনিময়ে সে বিপদ থেকেও অনেক কলা কৌশলে তাদের উদ্ধার করে দিলে।

গভীর রাত।

রণক্ষেত্রে ক্লান্ত সৈনিকের মতো সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে। কথা কইবার উৎসাহ পর্য্যন্ত তাদের স্তিমিত হয়ে এসেছে। সবাইকার মনে দুঃখের ইতিহাস এতবেশী জমে উঠেছে যে, শোনাতে গেলে শ্রোতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই এক সঙ্গে হয়ত বুকের বোঝা

হাল্‌কা করতে চাইবে। তার চাইতে সবাই মিলে চুপ করে থাকা অনেক ভালো। ভবিষ্যতে কোনো বৃহত্তর জীবন-যুদ্ধের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করারও ত প্রয়োজন আছে।

তাই ঝড়ের আগেকার নিস্তব্ধতার মতোই সারা কাম্‌রার লোক বাক্যহীন!

বেঞ্চগুলির মাঝখানকার স্বল্প পরিসর যায়গায় নোংরা ন্যাকড়া পেতে দিয়ে এখানে ওখানে ছোট ছেলে মেয়েদের শুইয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মুখ চোখের দিকে তাকানো যায় না।

ঝড়ে ওড়া পাতার মতোই ওরা নিরস—শুক্‌নো! আবার নতুন কোনো গাছের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওরা কি ফুল ফোটাতে, ফল ধরাতে পারবে?

মায়ের মগজে আজ রাজ্যের চিন্তা।

বুড়ো দাদুর কাছে ছেলেমেয়েরা আশ্রয় পেয়েছে—এটা ওদের পক্ষে মহাভাগ্যের কথা! ফটিক তার এক পাশে মরার মতো চোখ বুঁজে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। মনে হয় এ রাজ্যের সমস্ত ভাবনা চিন্তা থেকে সে ছুটি নিয়ে বসে আছে। ওদিকে বুড়ো দাদুর কোলে খুকু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুড়ো কিন্তু এত ভীড়ের মধ্যেও তার ছোট্ট হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টেনে চলেছেন। যেন কিছুই হয়নি··· তিনি তাঁর নিজের বাড়ীর দাওয়াতেই বসে আছেন—এমনি একটি নির্লিপ্তভাব এখন তার চোখে মুখে।

মন্থর গতিতে গাড়ী চলেছে।

কোনদিকে চলেছে, কোন ষ্টেশন ওরা ছাড়িয়ে এলো, কতক্ষণে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে—এ সম্পর্কে যেন কারো কোনো গরজ নেই।

মৃদু কণ্ঠে মা উত্তর করলেন, তাঁর প্রমাণ ত' আপনি। আজ আপনি এই কামরায় উপস্থিত না থাক্‌লে আমার ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ বেঁচে থাক্‌ত না।

লজ্জা পেয়ে ভদ্রলোকটি বল্লেন, না-না, আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি আবার একটা আলোচনার বিষয় নাকি ?

একটু চুপ করে থেকে মা বল্লেন, এই আমাদের গাঁয়ের কথাই ধরুন না কেন, কত আপনারজন ছিল তারা। কোথেকে বাইরের একটা কাল-বোশেখী ঝড় উঠ্‌ল একদিনে সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। অথচ মজা দেখুন, সেই চরম বিপদের দিনে যারা আমাদের লুকিয়ে রাখ্‌ল তাদের গোয়াল ঘরে—তারাও মুসলমান। অশিক্ষিত ভাই আর তার বোন। কিন্তু তারাই হল আসল মানুষ।

মনে হল কথাটা শুনে মুসলমান ভদ্রলোক ভারী তৃপ্তি পেলেন। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ থেকে জবাব দিলেন, আমার কি মনে হয় জানেন ? এই চল্‌তি দুনিয়ায় দুই কিসিমের লোক আছে। একদল ভালো, আর একদল মন্দ। হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন এখানে একেবারে অবান্তর।

মা মৃদুকণ্ঠে বল্লেন, সত্যি তাই।

ইতিমধ্যে খুকু একটু উস্‌খুস্‌ করে মায়ের হাত ধরে টান্‌তে লাগ্‌ল।

সেটা ভদ্রলোকের চোখ এড়ায় নি !

বল্লেন, বুঝ্‌তে পেরেছি খুকু, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমার সঙ্গে খাবার আছে, কিন্তু তা ত' তুমি খাবে না। সাম্‌নের ষ্টেশনে ভালো সন্দেশ পাওয়া যায় তাই তোমাদের ভাই-বোনকে কিনে দেবো' খন।

লাগ্‌লো! তিনি ছেলেমেয়ের মা, কিন্তু আজ তাদের হাতে ক্ষুধার সময় অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতাও তার নেই।

শুধু ট্রেনের কামরার বাইরেই যে অন্ধকার তা নয়—যতদূর চোখ যায় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে এতটুকু আলোর রেখা পর্য্যন্ত তিনি কোথায়ও খুঁজে পেলেন না।

মা তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে ছেলে-মেয়ের খাওয়া দেখ্‌ছেন! ওরা গোগ্রাসে খাবার গিল্‌ছে।

মার এক একবার মনে হচ্ছে এই ছেলে-মেয়ে যেন তিনি পেটে ধরেন নি! অন্য কোনো লোকের হ্যাংলা দুটি ছেলেমেয়ের খাওয়া তিনি দেখ্‌ছেন—নিতান্ত নির্লিপ্তের মতো! নইলে তার সন্তান কি এমনি রাক্ষসের মতো গিল্‌তে পারে?

ছায়া ছবির মতো কত কথা মায়ের মগজের ভেতর দিয়ে আনা-গোনা সুরু করে:

ঠাকুমা বল্‌ছেন ফটিককে,—ওরে ফটকে, খেলা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছে না! না হয় একটু পরেই যাবি। আমার মাথা খাস্‌…এই ছানার পায়েসটুকু মুখে দিয়ে যা'। আমাদের ধব্‌লির দুধের পায়েস… খেতে কিছু নিন্দের হয়নি। আর তোরা যদি না-ই খাবি তবে সারা দুপুর কাঠের জ্বাল দিয়ে মরলাম কি সব আমার চিতের ওপর ছড়িয়ে দিতে?

আরও একটা ছবি মায়ের মনের পটে ভেসে উঠ্‌ল।

নবান্নের দিন।

শীতকাল। ফ্যানা-ফ্যানা ভাত রাঁধা হয়েছে। তার ভেতর বেগুন সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, সিম সেদ্ধ, ডালের বড়ি সেদ্ধ, মিট কুম্‌ড়ো, মিঠে আলু...অনেক কিছু একসঙ্গে। আর তারই সঙ্গে রয়েছে খাঁটি গাওয়া ঘি। প্রত্যেকের পাতের কাছে দুটি করে কাঁচা লঙ্কা। শীতের দিনে এই খাদ্যটি গ্রাম দেশে ভারী মুখরোচক। যেদিন এই রকম ফ্যানা ভাত রান্না হবে—ছেলেমেয়ে কেউ আর থালায় খাবে না। সবাই বায়না ধরবে কলাপাতার জন্যে! কলাপাতায় ভাত মাখ্‌লে গাওয়া ঘীর জন্যে পাতাটা অবধি পিছ্‌লে ওঠে…ভারী ভালো লাগে এই ভাবে ফ্যানাভাত দলা দলা করে খেতে।

ঘ্যাস্ করে এসে গাড়ী থাম্‌লো সেই ষ্টেশণে।

আন্‌সার বাহিনীর দল—নানান্ গাড়ীতে উঠে পড়ল।

কাউকে ছাড়ান নেই—সবাইকে খানাতল্লাসীর ঘরে হাজির হতে হবে। মেয়েরা এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

জীবন থেকে সম্ভ্রমই যদি চলে গেল তবে আর রইল কি! যুগে যুগে এম্‌নি করেই সীতাদের সহস্র লোক চক্ষুর সাম্‌নে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়।

বসুমতী সয়ে যাচ্ছেন নির্ব্বিবাদে!

তিনি যে সর্ব্বংসহা!

*　　　*　　　*

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে গেরস্তর বৌঝিরা—এ কামরায়—ও কামরায়! তাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না!

ফটিক এক কোনে বসে দাঁত কিড়-মিড় করতে থাকে!

সে যদি বড়ো হত—আর তার গায়ে যদি স্যাণ্ডো কিম্বা ভীম ভবানীর মতো শক্তি থাক্‌তো তবে দেখে নিতো শয়তানদের। মা-বোনদের এই লাঞ্ছনা সে নীরবে কিছুতেই সহ্য করত না! এ এমন দেশ—পুরুষরা হেটমুণ্ডে বসে থাকে আর মেয়েরা কেবলি চোখের জল ফেলে!

দ্রৌপদীর চোখের জলে কুরুক্ষেত্রে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল। এ আবার কোন অলিখিত ইতিহাসের বীজ বপন করছে—একমাত্র অন্তর্য্যামি তা বল্‌তে পারে!

*　　　*　　　*

গাড়ী মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

—তাইত ! হিন্দুর মেয়েছেলে কেন মুসলমানের সঙ্গে ?

—কোত্থেকে আস্‌ছ খোকা-খুকু ?

—বল মা, কোনো ভয় নেই—

—আমাদের ক্যাম্পে চলো, কোনো অসুবিধা নেই—

এমনি হাজার রকম প্রশ্নে মা সচকিত হয়ে ওঠেন !

অনেকে আশে-পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মনগড়া কাহিনী রচনা করেন।

কেউ বলে, ব্যাটা-ছেলেদের সব কেটে ফেলেছে। এখন পয়সা কড়ির লোভে ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

—ওদেরও শেষ পর্য্যন্ত জাহান্নামের পথে পাঠাবে।

—ছিনিয়ে আন্‌না ওদের দুশমনটার হাত থেকে—

একদল অতি উৎসাহী কোমরে কাপড় জড়িয়ে এগিয়ে আসে—

—ও লোকটাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না। ধর ওকে পাক্‌ড়ে—

মুসলমান ভদ্রলোকের দু'পাশে লোক জড় হতে থাকে।

মা প্রথমটা সত্যি হক্‌চকিয়ে যান।

মুসলমান ভদ্রলোকও বুঝ্‌তে পারেন—একটা অজানা বিপদ তাঁর চারপাশে ঘনিয়ে এসেছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে মাকে বলেন, এইবার ত' আপনি আপন-জনের সন্ধান পেয়েছেন—আমার তা হলে ছুটি—

—ছুটি অত সহজে মিল্‌ছে না মিঞা—বলে একটি জোয়ান গোছ লোক মুসলমান ভদ্রলোকের জামার কলার চেপে ধরলে—

মা চীৎকার করে উঠ্‌লেন।

ওখানে যা দেখে এলেন এখানে কি তারই প্রতিক্রিয়া চল্‌বে নাকি ? তাঁর মনের কোনে সে কামনা ঠাঁই পায় নি—একেবারে।

···কিন্তু আজ তাদেরই চোখের সাম্‌নে আকাশ হয়েছে ধূসর··· তাদের মনে নেই ভবিষ্যতের আশা···দেহে নেই শক্তি···অনেকেই পথের কষ্টে আর রোগের তাড়নায় একাধিক ছেলেমেয়েকে হারিয়ে এসেছে। যারা কোনো রকমে বেঁচে আছে তাদের মুখের দিকেও ওরা ভরসা করে তাকাতে সাহস পায় না···নিজেরা ভুগ্‌ছে পেটের ক্ষিদেয় আর নানাবিধ রোগের জ্বালায়! রাত কাটে ত' দিন যেন কাট্‌তে চায় না···এমনি মর্ম্মান্তিক তাদের অবস্থা!

একটু যে মানুষ চোখ বুঁজে ঘুমুবে তারই কি যো আছে? দুঃখের পাঁচালি চলেছে ডাইনে বাঁয়ে···এপাশে ওপাশে···

এই অসীম দুঃখের অসহ্য-বিষ কোন্ নীলকণ্ঠ ধারণ করবে?

এরা প্রত্যেক বেলায় রেশন পায় আর পায় লক্‌ড়ি।

সারা মাঠ জুড়ে উনুন বসে যায় তাই ফুটিয়ে নেবার জন্যে।

কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো ফুটিয়ে নিয়ে প্রাণ ধারণ করতে হবে।

শেষ রাত্তির থেকে সবাইকার মাথায় টনক নড়ে ওঠে।

প্রাতকৃত্য বলে একটা কথা আছে।

তার কোনো ব্যবস্থাই এ অঞ্চলে নেই!

ফলে যা' হবার তাই হচ্ছে।

স্বাস্থ্য রক্ষার কোনো বালাই নেই এখানে।

যে যেখানে পারে কাজ সেরে আস্‌ছে।

দুর্গন্ধে দু'মিনিট দাঁড়ায় কার সাধ্যি!

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! ওদের ঘ্রাণ শক্তিও যেন কমে গেছে। বিষ্ঠা আর চন্দন সমজ্ঞান।

পরমহংস হবার আর বাকি নেই কারো!

তলায় প্রদীপ জ্বলে ওঠে না…মঙ্গল-শঙ্খ বাজে না তাদের আঁধার কুটিরে। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে অস্থি চর্ম্ম সার হয়ে তারা মরণের পথে এগিয়ে চলে।

বহু অনাথ ছেলে-মেয়ে ঘুরে বেড়ায় কুপার্স ক্যাম্পের বুকে।

তাদের দেখ্‌বার কেউ নেই। অচেনা যার সঙ্গে দেখা হবে—করুণ কণ্ঠে অনুরোধ জানাবে—দুটি ভাত দেবে? আচ্ছা, ভাত না দাও মুড়ি গুড় দাও—দু'দিন কেউ আমাদের রেশন দিচ্ছে না!

এমনি কাতরোক্তি সারা ক্যাম্প জুড়ে।

আর একটা দিকে মাড়োয়ারী রিলিফ্‌ সোসাইটি রান্না করা ভাত ডাল তরকারী বসিয়ে খাওয়াচ্ছে হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের।

প্রয়োজনের তুলনায় সেই আয়োজনই বা কতটুকু?

তাঁদেরও দোষ দেয়া চলে না।

পান্তা আন্‌তে লবণ ফুরোয়…প্রতিদিনকার একই সেই করুণ কাহিনী!

হাত পেতে খাদ্য চাইতে হবে—এমন অবস্থা মা কোনোদিন কল্পনাও করেননি।

ফটিক হেঁটে হেঁটে হয়রাণ · কিছুতেই রেশনের কুপন জোগাড় করতে পারে না। পেটের ক্ষিদেয় খুকু হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

শেষকালে মাড়োয়ারী রিলিফ্‌ সোসাইটির একটি স্বেচ্ছাসেবক দেখ্‌তে পেয়ে ওদের ভাইবোনকে ভীড় ঠেলে কোনো রকমে খাইয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু পরের স্নেহকাতর আঁখির দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে কটা বেলা এইভাবে কাটানো চলে?

তারা বেরুবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে অসুবিধে বেশী। নানা জনে নানান্ কথা জিজ্ঞেস করে। জবাব দিতে গিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তার চাইতে প্রখর দিবালোকে—হাজার লোকচক্ষুর সাম্‌নে সরে পড়লে কেউ লক্ষ্য পর্য্যন্ত করবে না! সবাই ব্যস্ত থাক্‌বে রেশন আর রান্না নিয়ে। কে এলো, কে গেল—এই বিরাট অবহেলিত আর অনাদৃত জগতে কে তার সন্ধান রাখে?

তাই উত্তপ্ত সূর্য্যালোকে মা ছেলে আর মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন কুপার্স ক্যাম্প থেকে। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন না; কাউকে অভিশাপ দেবার জন্যে তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠল না, এমন কি এক মুহূর্ত্তকাল থম্‌কে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে সজল চক্ষে কুপার্স ক্যাম্পের দিকে তাকালেন না পর্য্যন্ত তিনি।

যদি মরতে হয় ত' ভগবানের বিরাট রাজ্যে প্রশস্ত পথ পড়ে আছে। শুধু মনের কোনে একটি কামনা, একটি বাসনা যে, মরবার আগে ছেলে-মেয়ে তুটিকে কারো হাতে সঁপে দেওয়া চলে কিনা—যে ওদের নিঃস্বার্থভাবে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোল্‌বার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

কিন্তু কোথায় সে মানুষ যে স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে আশ্রয়ের জন্যে সবল হাতখানি বাড়িয়ে দেবে?

মা ধুক্‌তে ধুক্‌তে পথ চলেন আর এমন একটি মুখের জন্যে আকুলি-বিকুলি করেন—যে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, ইহুদী নয়–যে সোজাসুজি বল্‌বে, আমি মানুষ—এসো আমার সঙ্গে—

এ যুগে কি তেমন মানুষ একান্তই তুর্লভ?

দুদিন বাদে ফটিক মায়ের কাছে লাফাতে লাফাতে এলো। তার মুখ-চোখ আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল। বল্লে, কিছু ভেবো না তুমি মা, এখন থেকে আমি রোজগার করবো।

মা মুখ তুলে তাকালেন। অবাক হয়ে শুধোলেন, পাগল ছেলে! তুই রোজগার করবি কি রে! দাঁড়া, আগে তোর পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা করে দিই।

ফটিক মাথা দুলিয়ে আবদারের সুরে জবাব দিলে, তুমি কিচ্ছু বোঝনা মা, পড়াশোনা ছেড়ে দেবো—তোমায় কে বল্লে? সে ঠিক আমি চালিয়ে যাবো। তা' ছাড়াও উপায় করতে পারবো আমি। সেই কথাই শোনা না! আজই বাজার করতে গিয়ে ষ্টেশনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। রাণাঘাটে যত কাগজ আসে—অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী—সব তিনি আনান। চট্‌পটে ছেলে খুঁজছিলেন - সেই সব কাগজ বিক্রী করবার জন্যে। আমার মতো অনেক ছেলে রাজি হয়েছে মা! যে যেমন বিক্রী করতে পারবে—তার তেমনি আয় হবে। দেখে নিও তুমি—রোজ দু'টাকা করে আমি ফেল্‌বোই।

উত্তেজনায় আর আনন্দে ফটিক আন্দোলিত হতে থাকে।

মা আর ছেলের প্রস্তাবে আপত্তি করেন না। শুধু তাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ফটিক এই বয়সেই রোজগার করে মাকে খাওয়াতে চায়!

খুকু হাততালি দিয়ে বলে, বেশ হবে মা, বেশ হবে। দাদা পথে পথে লোকের কাছে হাঁক্‌বে—নয়া খবর, টাট্‌কা খবর,—যুগান্তর,

কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, ফটিক তার মাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি। গাঁয়ের সেই আদরে-আবদারে মানুষ, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো ফটিক একেবারে বদ্‌লে গেছে। অসম্ভব পরিশ্রম করছে সে। তাই রোজ দুটাকা করে তার পাওনা হয়—আর টাকাটা সে মায়ের হাতে এনে দেয়।

অবিনাশবাবু রসিকতা করে বলেন; দেখ্‌লে বৌদি, তোমার ছেলের যোগ্যতা? কাকার টাকায় খাবে না বলে—কেমন রাতারাতি উপায় করতে শিখেছে!

মা জবাব দেন, ঠাকুরপো, তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলে বলেই ত' ফটিক রোজগার করতে শিখেছে। নইলে আমি আর কবে ভেবেছিলাম যে, পেটের শত্তুরের রোজগারে পেট ভরাতে হবে।

—হুঁ! বৌদির যেমন কথা! হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দেন অবিনাশবাবু। মা ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লেন, তোর রোজগারের টাকা আমার কাছে না দিয়ে তোর কাকার হাতে দিস্—উনি খুসী হবেন।

এবারে জীর্ণ নৌকোকে গাব লাগালে যেমন হয় তেমনি মায়ের জোড়াতালি দেয়া সংসার কোনো রকমে আবার পাড়ি জমাতে সুরু করলে!

গোপনে গোপনে অবিনাশবাবুও আবার দুটো নতুন টিউশনি নিয়েছেন কিন্তু মুখে সে কথা কিছুতেই স্বীকার করেন না! সতু কিন্তু তাঁর দেরীতে বাড়ী ফেরা দেখে ঠিক ধরে ফেলেছে।

এই নিয়ে একদিন বাপে-বেটিতে তুমুল ঝগড়া!

দেশের নামকরা লোকেরা আমাদের পরিচয় রাখেন! "বিশ্বব্যথা নিবারণী সমিতির" নাম শোননি? খবরের কাগজে আমাদের সৎকাজের কথা বড় বড় হরফে প্রায়ই বেরোয়। দেশের ধনীরা আমাদের কাছে চাঁদা পাঠিয়ে দেন মানুষের ব্যথা বেদনা দূর করবার জন্যে। কে বাস্তুহারা হয়েছে, কে খেতে পারছে না, কে অসুখে ভুগ্‌ছে, কে মামলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে....সব আমাদেরই দেখ্‌তে হয়—খোঁজ-খবর নিতে হয়। তোমাদের মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি—তোমাদের ব্যথার অন্ত নেই। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, আপনি আর মিছিমিছি রদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না। ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন গাড়ীতে। আপনাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি নিঃশ্বাস ফেল্‌বার ফুরসুৎ পাবো।

মা যেন অদৃষ্টের ওপর একেবারে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘর থেকে চলে যেতে বল্লেও যেমন প্রতিবাদ করতে পারেন না—তেমনি আদর করে আশ্রয় দিতে চাইলেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হন না।

সবই যেন তাঁর গা-সয়া হয়ে গেছে।

—কোথায় নিয়ে যাবে বাবা আমাদের? এ প্রশ্ন উত্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তাও যেন তাঁর জীবন থেকে ফুরিয়ে গেছে।

ফটিক আর খুকুকে দুই হাতে ধরে বিনা প্রতিবাদে তিনি গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন।

ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে বসে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জোরে গাড়ী ছাড়বার আদেশ দিলেন।

রাজ পথের তপ্ত ধূলো উড়িয়ে জীপগাড়ী ঝড়ের বেগে উড়ে চল্লো।

লাগিয়ে দিতে পারি। সেগুলো বিক্রি ক'রে বেশ পয়সা রোজগার করা যাবে। তুমি দেখে নিও মা।

মা শুনে যান্ ছেলে মেয়ের কথা ; কিন্তু কোনো জবাব দেন না। তাঁর মাথায় শুধু এক চিন্তা। কি ক'রে ছেলে-মেয়ে ছুটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন—তাদের লেখা পড়া শেখাবেন, মানুষ ক'রে তুল্‌বেন।

ধূপ পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলোয়, সল্‌তে নিজে পুড়ে আলো দেয়। নিজের জীবনকে ছাই করে দিয়ে মা কি কোনো মতেই ছেলে-মেয়ে ছুটিকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে পার্‌বেন না ?

ভদ্রলোক যখন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছে···তখন শেষ পর্য্যন্ত একটা ব্যবস্থা হবেই।

মায়ের মন আকাশে নিজের অজান্তেই স্বপ্ন-সৌধ গড়ে তোলে। চ্যাটাইয়ে শুয়ে আকাশ-কুসুম ফোটানোর মধ্যে বেশ একটা আমেজ আছে। সেই স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম যখন ভাঙল—তখন একেবারে বিকেল।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, ছেলে মেয়ে কেউ ঘরে নেই।

জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে চাইতেই বাগানের মাঝখানকার খালি জায়গাটিতে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ল ! ওরা দল বেঁধে সবাই খেল্‌ছে।

মায়ের মনে পড়ল, কতদিন ফটিক আর খুকু খেলতে পায় না। বেড়াল-কুকুরের ছানার মতো—তিনি ওদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন···কিন্তু কোথায়ও এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না।

উমারাণীর মার বয়েস বেশী নয়। কিন্তু এরি মধ্যে সাম্‌নের অর্দ্ধেক চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে পড়েছে কালি। কপালে দুশ্চিন্তার অসংখ্য রেখা। অথচ এই মহিলাটি সারাজীবন প্রাচুর্য্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন। বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বৌ···অভাব ছিল না কিছুরই। উমারাণীকে হারাবার পর এখানকার পুকুরের জলে ডুবে মর্‌তে গিয়েছিলেন। কিন্তু লোকে তাকে মরতেও দেবে না! সবাই ধরাধরি করে তুলেছে। দণ্ডধরবাবু ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করিয়ে ভালো করিয়েছেন। "বিশ্ব ব্যথা নিবারণী সমিতি" কিনা! সেবার কাজও দেখাতে হবে ত'!

মা বল্লেন, আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন—এখানকার ব্যাপারটা কি? উমারাণীর মা ম্লান হেসে জবাব দিলেন, আর আপনি কেন ভাই? এখানে আমরা সবাই তুমি। তোমাকে আস্‌তে দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমাদের একেবারে ঘরের মানুষ। তাই ত' মনের কথা কইতে এলাম। যখুনি এই বাগানের ফটক ডিঙিয়েছ—তখুনি আবার নতুন করে কপাল পুড়ল।

—তুমি বলছ কি উমারাণীর মা? মায়ের মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। উমারাণীর মা জবাব দেন, তোমার ছেলে ফটিককে ডেকে আমি কথাবার্ত্তা বলেছি। ওর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়ে গেছে। তোমায় আমি ফটিকের মা বলেই ডাক্‌বো, কেমন?

মা বল্লেন, তাই ডেকো বোন্। কিন্তু তোমার কথা শুনে বুক আমার কেঁপে উঠ্‌ছে। সব খুলে বলো আমায়। একটুও স্বস্তি পাচ্ছি না আমি।

কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন উমারাণীর মা। মায়ের মুখে আর কোনো কথা সরে না !

হতবাক্ হয়ে তিনি খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন।

চোখের জল মুছে উমারাণীর মা আপন মনেই যেন বলে চলেন, তা-ও যে মেয়ের জন্য নিরিবিলি বসে দু'দণ্ড কাঁদবো তারও উপায় নেই ! দণ্ডধরের চেড়ীর দল সর্ব্বদা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। আর কি খাটুনিটাই না খাটিয়ে নেয়—সবাইকে। ঘুঁটে দাও, ঝুড়ি তৈরী করো, কাগজের ঠোঙা বানাও, নানারকম আচার তৈরী করো। সব ব্যবসা। বুঝলে দিদি, আমাদের দিনরাত খাটিয়ে অঢেল টাকা করে নিচ্ছে এই দণ্ডধরের দল।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

কারো মুখে কোনো কথা সরছে না।

দু'জনের বেদনার-পাত্র যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলবার-কইবার আর কি আছে ? আর বেশী কিছু বলতে গেলে বেদনার পাত্র উপ্‌ছে পড়বে।

হঠাৎ ঘরের কোনে একটি নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ হাঁক শোনা গেল। —ও উমারাণীকা মা,—বহুৎ রাত হল ঘরকে চলো—

পশ্চিম দেশীয়া এক মোটা স্ত্রীলোক।

যেমন দেখতে – তেমনি তার গলার স্বর।

উমারাণীর মা যে চেড়িদলের কথা খানিকক্ষণ আগে বলেছিলেন—এ তারই একজন,—নাম দুখিয়া। মূর্ত্তিমান্ দুঃখই বটে।

উমারাণীর মা ফিস্ ফিস্ করে বল্লে, ওই যে—চেড়ির টনক নড়েছে। চল্লাম আমি। ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব সাবধানে থেকো।

আমাদের কথাবার্ত্তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। ওই যে, কথা আছে—সাগরে শয্যা পেতেছ—শিশির দেখে ভয় পেলে চলবে কেন?

উমারাণীর মায়ের চোখে-মুখে সর্ব্বহারার ম্লান হাসি।

গভীর রাত।

চ্যাটাইয়ে শুয়ে মা কেবলি এপাশ-ওপাশ করছেন। ঘুম আর কিছুতেই আসছে না। মনে হচ্ছে ব্যাঁকারীর জানালার ফাঁক দিয়ে কে যেন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। মা প্রাণপণে খুকুকে বুকে চেপে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

আটাশ

ফটিক সেদিন লাফাতে লাফাতে এসে তার মাকে বল্লে, এ কোন্ জায়গায় আমরা এলাম মা, গেটে দুটো জাঁদ্রেল দারোয়ান বসে আছে, বলে কিনা বাহার জানে কো হুকুম নেহি।

মা ফটিককে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কি একেবারেই বাইরে বেরুতে দেবে নারে?

ফটিক উত্তর করলে, তাই ত' শুনলাম মা। ছেলেরা সবাই সেই কথাই আমায় বল্লে। বাগানের ভেতর থাকো, ঝুড়ি তৈরী করো, ঠোঙা বানাও, গাছের শুক্‌নো ডাল কুড়িয়ে জড়ো করো, বড় জোর সন্ধ্যেবেলা খানিকক্ষণ খেলা করতে পাবে। বাইরে বেরুতে গিয়েছ কি হুকুম নেহি— !

মায়ের চোখ দুটো হঠাৎ একবার জ্বলে উঠল। তিনি বল্লেন,

তাকিয়ে বল্লে, এই বাগানে যে আওরৎ সব-সে-সেরা ঝুড়ি বানাতে পার্‌বে—মাহিনা শেষে বাটি-ভর দুধ মিলবে তার।

অতি দুঃখে মা এইবার হেসে ফেল্লেন। ভালো ঝুড়ি তৈরী কর্‌তে পার্‌লে মাসের শেষে এক বাটি দুধ মিলবে।

নিজের দেশের বাড়ীর দুধোলো গাইগুলির কথা মনে পড়ল।

মায়ের চোখ দুটি আপনা থেকেই জলে ভরে এলো।

ফটিক মায়ের ব্যথা বুঝতে পেরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে এলো। তার মনের যে অবস্থা তাতে যে কোনো সময় সে দুখিয়ার মাথা নিয়ে ফুটবল খেলা সুরু করে দিতে পারে!

কিন্তু মা বলেছেন, এখন কোনো মতেই রাগারাগি করা চলবে না। তাতে নাকি তারা বিপদে পড়তে পারে।

মায়ের বিপদ হয়েছে আরো বেশী।

মনে যখন আগুন জ্বলতে থাকে অথচ প্রতিকারের কোনো উপায় নেই—তখন মায়ের হাত আরো বেশী দ্রুত হয়ে জড়িয়ে পড়ে নানা কাজে। ফলে—মা অন্যমনস্ক হয়ে রাশি রাশি ঠোঙা তৈরী করে ফেলেন; প্রচুর ঝুড়ি তৈরী করে তোলেন; আর সে ঝুড়ি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখবার মতো।

মানুষ যখন মানুষের দুর্ব্বলতার সন্ধান পায়—তখন তাকে নানাভাবে কাজে লাগায়—সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে আরো তৎপর হয়ে ওঠে।

দণ্ডধরবাবু বেশ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, মায়ের মুখে একেবারে কথা নেই। অন্য সবাইকার মতো কোন্দল বা কলহের ধার দিয়ে যান

মা শুধু ছেলের মুখখানি নিজের হাড় বের করা শুক্‌নো বুকে জড়িয়ে ধরেন। চোখের জল মায়ের শুকিয়ে গেছে। কথায় কথায় আর তা পড়ে না! যেখানে ছিল ছায়ায় ঘেরা স্নিগ্ধ সরোবর—আজ সেখানে একটি বালিময় মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে!

মুখে কথা নেই। মনের জ্বালা ভোলবার জন্যে দিন রাত্তির কাজ করে চলেছেন মা। হাতের এতটুকু বিশ্রাম নেই তাঁর!

সারাদিন ধরে এমন খাটুনি···কিন্তু সারা রাত ঘুম নেই মায়ের! শুধু চ্যাটাইয়ে শুয়ে এপাশ আর ওপাশ!

মায়ের ব্যথা এই প্রেতপুরীতে কে বুঝ্‌বে?

এক পাশে ফটিক—এক পাশে খুকু।

দুবেলা শুধু ভাত-ডাল পায়। মাঝে মাঝে তরী-তরকারী। ক্ষিদের জ্বালায় ওরা এমন নেতিয়ে পড়ে অঘোরে ঘুমায় যে, বেঁচে আছে কিনা তাও বোঝা যায় না!

মা ওদের দুটির চোখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারেন না।

মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে আর দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়।

বাগানের মধ্যেকার ওই পুকুরের ঠাণ্ডা জল। উমারাণীর মা নাকি ওরি মধ্যে একবার ডুবে মর্‌তে গিয়েছিলেন। মা-ও হয়ত বুকের জ্বালা জুড়োতে—ওই শীতল জলের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু তাঁর অভাবে ফটিক আর খুকুর কি হবে?

স্বর্গে গিয়েও ত' মা সোয়াস্তি পাবেন না।

আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন মা।

পাঁজরের হাড়গুলি এক এক করে গোনা যায়। চ্যাটাইয়ে পাশ ফির্‌তে বেশ লাগে। শরীরে এখন আর মাংস নেই···শুধু হাড় ক'খানা।

বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে,—খুকু বাগানের মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা শেষ করে একা একা গাছতলা দিয়ে ফিরে আস্‌ছে।

একটা ঘন আমগাছের নীচে যেখানে আঁধারটা খুব জমাট বেঁধে রয়েছে—সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন দণ্ডধরবাবু।

খুব ছুটোছুটি করে খেলেছে খুকু। ফিরতি পথে এখন বেশ বুঝ্‌তে পারছে যে, ক্ষিদেয় তার পেট জ্বলে যাচ্ছে! সারা ব্রহ্মাণ্ড খেলেও ক্ষিদে মিট্‌বে না—এমনি সে জ্বালা! মায়ের কাছে গেলে মিল্‌বে—ও-বেলার শুক্‌নো কড়কড়ে ভাত আর খানিকটা ডাল। তরকারী কিছু আছে কিনা তাও বলা যায় না! খেল্‌তে খেল্‌তে খানিকটা পুকুরের জল আজ্‌লা করে খেয়ে নিয়েছে। তাতে পেটের ভেতরটায় এখন পাক্ দিচ্ছে!

সেই আম গাছটার কাছে আস্‌তে—দণ্ডধরবাবু এগিয়ে এলেন। বল্লেন. এই যে খুকু, খেলা শেষ করে বাড়ী ফিরছ বুঝি?

খুকু হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে কথা শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো। তারপর দণ্ডধরবাবুকে চিন্‌তে পেরে বলে,—হ্যাঁ. মার কাছে যাচ্ছি—

দণ্ডধরবাবু এক গাল হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, আমি বাগানের ছেলে-মেয়েদের এক একদিন এক একজনকে সন্দেশ খাওয়াই। আজ কিন্তু তোমার পালা।

খুকু ঠোঁট উল্টে জবাব দিলে, আপনি খাওয়াবেন সন্দেশ! তবেই হয়েছে!

দণ্ডধরবাবু আজ যেন জিবে মধু মাখিয়ে এসেছেন।

বল্লেন, না-না, তুমি জানো না খুকু। সবাইকে অবাক করে দেওয়াই ত' আমার কাজ! কেউ জানে না, কিন্তু এক একজন এক

ঊনত্রিশ

মা ফটিক আর খুকুর জন্যে রাত্তিরের ভাত চাপিয়েছিলেন।

ওবেলার নিরিমিষ তরকারী আর ডাল রয়েছে। দাওয়ায় বসে তোলা উনুনে শুধু ভাতটা সেদ্ধ করে নিলেই সন্ধ্যের মতো নিশ্চিন্দি।

পাশে বসে উমারাণীব মা সুখ-দুঃখের কথা কইছিলেন। যে মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়েছেন—তা থেকে কোনো মতেই আর নিস্তার নেই কারো।

মা কথা কম বলেন শুধু শুনে যান।

ফটিক বল্লে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে—কেমন গাড়ীতে চাপিয়ে আমাদের এখানে এনে আটকে রাখলো। আগে যদি একটুও বুঝতে পারি যে গুঁফো লোকটার মতলব ভালো না—তবে কি আর তার কথা শুনি?

উমারাণীর মা জবাব দিলেন, কতকগুলো লোক আছে সংসারে যারা সব সময় মুখোস পরে বেড়ায়। হঠাৎ দেখে তাদের চেনা যায় না। অচেনা মানুষ—যারা দুঃক্ষু-কষ্টে এমনি নেতিয়ে পড়ে আছে তারা অতি সহজেই ওদের কথায় বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দেয়। সে ফাঁদ থেকে আর কোনো মতেই মুক্তি পায় না।

মা এবারেও কোনো কথা বল্লেন না; শুধু কাঠি দিয়ে হাঁড়ি থেকে একটা ভাত তুলে নিয়ে টিপে দেখলেন, সেদ্ধ হয়েছে কিনা।

ফটিক গলাটা একটু খাটো করে বল্লে, জানো মা, আমি যদি কোনো রকমে একবার বাইরে বেরুতে পারি—একটা চাকরী জোগাড়

না ? মেয়েরা কি অন্ধকারেও বাগানের ভেতর ছুটোছুটি খেলছে নাকি ?

ফটিক একবার বাগানের দিকে তাকিয়ে বল্লে, আজকাল যা দুষ্টু হয়ে উঠেছে খুকু। কি রকম কলাগাছের মতো লম্বা হয়েছে দেখেছ মা ! আর তার সঙ্গী-সাথীও জুটেছে সেই রকম।

উমারাণীর মা বল্লেন, মেয়েকে চোখে-চোখে রেখো ফটিকের মা ! এ জায়গাটা মোটেই ভালো না। অম্‌নি ধম্মের নামে ছেড়ে দিয়েই ত' আমি আমার উমারাণীকে হারালাম। কি আর এমন বয়েস হয়েছিল ওর ? মোটে চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরো'তে পা দিয়েছিল।

মায়ের বুকের ভেতর কেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। বল্লেন, অন্ধকার হয়ে গেছে। ভালো করে তাকিয়েই দেখি-নি। যা ত' ফটিক, খুঁজে নিয়ে আয় ওকে। আজ সত্যি আমি ওকে শাসন কর্‌বো। মেয়ে ছেলের এত বাড় কি ভালো ? খেলবি খেল। কিন্তু আঁধার হয়ে গেল তবু ধিঙ্গি মেয়ের বাড়ী ফেরার নাম নেই।

ঘর থেকে ফটিক চীৎকার কর্‌তে সুরু কর্‌ল, ওরে খুকু— শীগ্‌গির বাড়ী আয়—খুকু—কোথায় গেলি রে—

—আর একটু এগিয়ে দেখ বাবা—মা বল্লেন। ফটিক ডাক্‌তে ডাক্‌তে চলে গেল বাগানের আর এক প্রান্তে।

মা সত্যি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। খেলার পর বাড়ী ফির্‌তে এত দেরী ত' খুকু কোনো দিন করে না।

বল্লেন, আমারই দোষ উমারাণীর মা। ঝুড়ি তৈরী করার কাজে এত বেশী ঝুঁকে পড়েছিলাম—যে সারা বিকেলে মেয়েটার একবার খোঁজও করিনি। খেলতে যাবার আগে খিদে-খিদে কর্‌ছিল, আমি

এমন সময় একটি মেয়ে এসে ফটিকের কাছে দাঁড়ালো। নাম তার শীতলা। খুকুর সমবয়সী আর খেলার সাথী।

মায়ের কথাগুলি তার কানে গেছে। শীতলা বল্লে. না মাসিমা, কিছুক্ষণ আগে আমি অফিসে গিয়াছিলাম—দুশো ঠোঙা জমা দিতে। তার আগেই ত' আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেছে। খুকু বল্লে, তার ক্ষিদে পেয়েছে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলো।

শীতলার কথা শুনে মা ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ; উমারাণীর মাকে বল্লেন, তুমি বোন্ ভাতটা একটু ঢেকে রাখো, আমি নিজে গিয়ে খুকুকে খুঁজে আনি। ও আমার ওপরই অভিমান করে আছে। খিদে সে কোনো দিনই সইতে পারে না।

কেউ কিছু বলবার আগেই মা দ্রুতপদে সেই বাগানের পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

উমারাণীর মা ফটিককে বল্লেন, দাওয়ায় এসে বোসো বাবা! তোমার মা এক্ষুনি ফিরে আস্‌বে। দেখ-দিকিনি কি অদৃষ্টের গেরো, সাম্‌নে রাঁধা গরম ভাত···কপালে না থাক্‌লে এম্‌নি হয়।

তিনি দাওয়ার ওপরে উঠে একটা মালসা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা ঢেকে রাখলেন।

ওদিকে বাগানের আর এক প্রান্ত থেকে ব্যাকুল মায়ের বুক-ফাটা ডাক ভেসে আস্‌তে লাগলো—খুকু, ওরে আমার খুকু, বাড়ী আয়—

ফটিক দাওয়ায় বসে ভাবতে লাগলো, মা-ত' কখনো এমন চীৎকার করে কাউকে ডাকে না। আজ মার হল কি ?

এই গোপেশ কি বল্‌ছে তোমরা সবাই শোনো—একজন বয়স্কা মহিলা শুধোলেন, হ্যাঁরে গোপেশ, তুই কিছু জানিস্? খুকুকে দেখেছিস্?

গোপেশ চোখ দুটো বড় বড় করে জবাব দিলে, সেই কথাই ত' বল্‌তে এলাম। আজ সন্ধ্যেবেলা আমি একটা ঝাপড়া আম গাছে উঠে লুকিয়েছিলাম। পালাবার ফন্দীই খুঁজ্‌ছিলাম। হঠাৎ দেখি সেই গাছ তলায় দণ্ডধর ব্যাটা। খুকুকে . বল্লে, সন্দেশ খাওয়াবো। খুকুটা এমন বোকা। সেই শয়তানটার কথায় ভুলে সন্দেশের লোভে জীপে করে ওর সঙ্গে চলে গেল।

তারপর একটা ঢোক্ গিলে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, কিন্তু খুকু কি এখনো ফিরে আসে নি?

মা চীৎকার করে উঠলেন, না-না, আমার খুকু এখনো ত' ফিরে এলো না—তোমরা খুঁজে পেতে তাকে এনে দাও—সে ক্ষিদেয় যে কাঁদছে!

হঠাৎ একটা মোটা গলা শোনা গেল—এখানে এত ভীড় কিসের?

সবাই চম্‌কে গেল। তাকিয়ে দেখ্‌লে—সে আর কেউ নয়—স্বয়ং দণ্ডধরবাবু। সঙ্গে দুটো জোয়ান হিন্দুস্থানী চাকর।

দণ্ডধরবাবুকে দেখে মায়ের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল। ছানা হারিয়ে বাঘিনীর যে অবস্থা হয় হঠাৎ মায়ের শান্ত মূর্ত্তি সেই রকম উগ্র হয়ে উঠল।

কেউ বাধা দেবার আগেই তিনি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দণ্ডধর বাবুর জামার কলার চেপে ধরে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লেন, দাও—দাও আগে আমার খুকুকে ফিরিয়ে দাও—

আর কিছুতেই টিক্‌তে পার্‌বে না। মাসিকে না জাগিয়ে সে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে চলে এলো। রাশি রাশি তারা যেন চোখ মেলে তাকিয়ে বল্‌ছে,—ওরে তোর আজ কেউ নেই। শেষকালে ছিল মা আর বোন—আজ রাত্তিরে তাদেরও তুই হারিয়েছিস্‌!

ফটিক উদ্‌ভ্রান্তের মতো আশে-পাশে তাকালো।

শুধু একটানা ঝি-ঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে—আর অন্ধকারে ঝোপে-ঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে।

ফটিক বুঝ্‌লে, এই বাগানে সে আর কিছুতেই থাক্‌তে পারবে না মেরে ফেল্লেও না। গোটা বাগানের লোকগুলোকে কে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে! এই সুযোগ···সে মরুক আর বাঁচুক তাকে—এই অন্ধকার রাত্তিরেই পালাতে হবে।

কিন্তু উপায় কি? ফটিক সারা বাগানে নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়ায় আর নিজের চুল ছিঁড়তে থাকে।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল প্রাচীরের ধারে ঝোপঝাড়ের ভেতর সোজা উঠে গেছে এক নারকেল গাছ।

এই নারকেল গাছে কি ওঠা যায় না?

যখন প্রাণের ভয় থাকে না—মানুষ তখন মরিয়া হয়। সুস্থ অবস্থায় যে কাজ করা যায় না তখন তা অতি সহজেই করা চলে।

সাপ?—সাপই বা কি করবে তার? মোট কথা অভিশপ্ত বাগান থেকে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে।—নইলে—এম্‌নিতে দম বন্ধ হয়েই সে মারা পড়বে! বহু ফণী-মনসার গাছে জঙ্গল হয়ে গেছে। গা হাত পা ছড়ে যেতে লাগ্‌ল। তবু ঝোপ-ঝাড়

ত্রিশ

অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়তে সে একেবারে পুকুরের জলে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাল-বিল নদী নালার সঙ্গে অতি ছেলে বেলা থেকে যার অমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়—পুকুর থেকে পাড়ে উঠ্‌তে তার বেশীক্ষণ দেরী হল না!

শেষ রাত্তিরের সেই আলো-আঁধারের কুহেলি ঢাকা স্বল্প পরিসর বন-পথ দিয়ে ফটিক ঠিক যেন পাগলের মতো ছুটে চল্‌লো। কোথায় যাবে সে জানে না, কোন গৃহকোনে তার আশ্রয় মিল্‌বে একথাও তার জানা নেই, দ্রুত ছোটার জন্যে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে যাবার ভয়ও তার কিছু নেই– সে শুধু চলেছে।

ফণী-মনসার গাছের কাঁটায় তার পা আগেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এইবার ভিজে কাপড়ে ছুট্‌তে গিয়ে বহু যায়গায় পড়তে পড়তে টাল সাম্‌লে নিচ্ছিল।

ভেজা চুল থেকে যে জলের ধারা বেয়ে পড়ছিল তারই সঙ্গে নিজের অজান্তে চোখের জল মিশে ফটিকের পথ চলায় ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু চল্‌তে আর ছুট্‌তে তাকে হবেই।

ফটিকের কেবলি মনে হচ্ছিল—এই অভিশপ্ত বাগান থেকে যতদূর হোক ছুটে চলে যেতে হবে। এখানে সারা গায়ে কে যেন জল বিছুটি ঘসে দিতে থাকে, একটা অব্যক্ত বেদনা কেবলি বুকের মধ্যে থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। শয্যা-কণ্টক বলে একটা কথা সে ছেলেবেলা থেকে ঠাকুমার মুখে শুনেছিল। এই বাগানে এসেও তার সেই অবস্থা হয়েছিল। সব সময় যেন কাঁটা বিঁধছে গায়ে। বস্‌তে কাঁটা,

গদাধর কোলে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠ্লেন, কি গেরো, কি গেরো! ছেলেটা যে রাস্তা থেকে কিছুতেই উঠ্ছে না। এখন কি করা যায় বলত? রাগে ফুলছিলেন কোলেমশাই। খানিকটা ইতঃস্তত করে ড্রাইভারকে বল্লেন, এই ড্রাইভার, টেনে হিঁচ্ড়ে ওটাকে সরিয়ে দাও রাস্তার একপাশে!

কোলে মশায়ের বুড়ো মা হা-হা করে উঠে বল্লেন, না-না—ওকথা মুখেও আনিস্‌নে বাবা। যাচ্ছি একটি পুণ্যের কাজ করতে। ওই ছেলেটাকে নির্যাতন করে লাভ কি? বরং দেখ—ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল নাকি।

ঠাকুমার কথায় তার এক নাতনী মুখ বাড়িয়ে বল্লে, ঠাক্‌মা তুমি না ক'দিন থেকে এক ছোক্‌রা চাকরের কথা বল্‌ছিলে? তা ওকে তুলে নাও না ট্রাকে—বেশ কাজ চলে যাবে তোমার।

ফটিক এইবার মুখ তুলে তাকালো। মেয়েটিকে দেখ্‌তে ঠিক অনেকটা খুকুর মতো। তেমনি কোঁকড়া চুল, আর তেমনি উজ্জ্বল চোখ।

কোলে মশাই এরই মধ্যে একেবারে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, কি রে কাজ করবি?

যে বোনকে সে হারিয়েছে—সেই রকম চেহারার মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে ফটিক ঘাড় নাড়লে; তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বল্লে, বড্ড ক্ষিদে—

ঠাকুমা জিবটা তালুতে ঠেকিয়ে একটা শব্দ করে বল্লেন, আহা! বাছা বোধ হয় ক'দিন খায়নি। কোলেমশায়ের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে কইলেন, পুণ্যের কাজ করতে যাচ্ছি···, নারায়ণের জীবকে

'না' বলা চল্‌বে না! এরা আশ্রয় দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এদের কাছে চাকরী করবে সে স্বীকার করেছে, কাজেই তাদের হুকুম মরি-বাঁচি করে তামিল করতেই হবে।

ধুতি-সাড়ী সেমিজ-সায়ার বোঝা নিয়ে ফটিক ওদের পেছন-পেছন রওনা হল।

গঙ্গার ঘাটে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

কোলেমশাই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কোনো রকমে পথ করে চল্লেন।

গঙ্গার তীরে একটা গাছ। তারই তলায় কাপড়ের বোচ্‌কা নিয়ে ফটিককে তিনি বসিয়ে দিলেন।

গাছের তলায় একদল ছেলে ইতিমধ্যেই দিব্যি আসর জমিয়ে ফেলেছে। সেই দলে রয়েছে—গণেশ, তারাদাস, আনন্দ, অতনু, চন্দ্রশেখর, সুচারু, মুরারী, অলক প্রভৃতি। সঙ্গে আছে তাদের মাষ্টারমশাই।

এই কিশোর দল নিজেদের চেষ্টায় একটা ব্যায়ামাগার গড়ে তুলেছে। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে চলে ব্যায়াম আর কুস্তি। শেষ রাত্তিরে ওরা দল বেঁধে আসে কাশীমিত্তিরের ঘাটে। প্রত্যেকের সঙ্গে স্নানের সরঞ্জাম, আর এক শিশি করে সরষের তেল। দেহে তৈল মর্দ্দন করে শরীরকে মজ্‌বুত করে তোলা এদের সবাইকার অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ। তারপর চলে তাদের গঙ্গার বুকে সাঁতার কাটা। কখনো ওরা মাল বোঝাই নৌকোর হাল বেয়ে ছাদের ওপরে ওঠে··· তারপর সেখান থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়ে পড়ে, আবার কখনো বা লঞ্চের দড়ি ধরে উত্তাল তরঙ্গে পাড়ি জমায়। চিৎ সাঁতার দিয়ে কেউ

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ফটিক শিউরে উঠ্‌ল !

এই জীবন নিয়েই কি তাকে বেঁচে থাকতে হবে ? কত আশা করে মাকে নিয়ে এসেছিল এদেশে···মায়ের মনে স্বপ্ন জেগেছিল···তার ফটিক লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে···দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে,—মায়ের দুঃখ দূর করবে !

আজ কোথায় তার মা আর কোথায় সে !

ছ' মাস আগেও যখন সে বই হাতে ইস্কুলে যেতো···সে কি ভুল করেও ভাব্‌তে পারত যে, একদিন ছোক্‌রা-চাকর হয়ে তাকে এক বাড়ীতে মাথা গুঁজ্‌তে হবে ?

তার চারদিকে যেমন রাশি রাশি মানুষ পুণ্যের জন্যে পোকার মতো কিল্‌বিল করে বেড়াচ্ছে তেমনি ফটিকের মগজে অসংলগ্ন চিন্তাগুলি একটা আলোড়নের সৃষ্টি করল।

হঠাৎ গঙ্গার তীরে তীরে একটা কোলাহল আর চীৎকার শোনা গেল—বান আস্‌ছে, বান আস্‌ছে—পালাও সব—

সঙ্গে সঙ্গে ওই পোকার মতো মানুষগুলি পুণ্যির প্রলোভন ত্যাগ করে প্রাণের ভয়ে ভেড়ার পালের মতো যে যেদিকে পারে ছুট্‌তে সুরু করে দিলে। ফটিক এক লহমায় তাকিয়ে দেখ্‌লে, কোলেমশাই তাঁর ছেলে-মেয়ে মা-বৌকে ফেলে ওই মোটা দেহ নিয়ে পড়ি-কি মরি করে ছুটছেন !

কিন্তু সে নিজের যায়গা থেকে উঠ্‌ল না—ছুটেও পালালো না।

হঠাৎ তার মনে হল, এই যে চঞ্চল উন্মত্ত বারি রাশি অধীর আগ্রহে ছুটে আস্‌ছে···এই তরঙ্গের দল তাকে আহ্বান জানিয়ে

সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা একজন দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। তিনি বল্লেন, উঁহু! এ মায়ের কোল-টোল কিচ্ছু নয়। একেবারে আত্মহত্যার ব্যাপার। একটু দাঁড়িয়ে যেতে হল। আসছে কালের কাগজে মোটা হরফে খবরটি ছাপিয়ে দিতে হবে।

আর একটি মোটা-সোটা ভূড়িওয়ালা বুড়ো নাভিতে তেল মাখ্‌তে মাখ্‌তে বল্লেন, আর মশাই! স্রেফ সাতদিন না খেয়ে রয়েছে। চারদিক থেকে লোক পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আস্‌ছে কল্‌কাতায় আর পোকার মতো মরছে! এটা আবার একটা খবর নাকি? বরং খবর বল্‌তে পারেন আমার মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা। আজই পুণ্যদিনে আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করছি বরানগরের গঙ্গার ধারে।—বলে তিনি আড় চোখে একবার খবরের কাগজের সংবাদ দাতার দিকে তাকালেন।

কিন্তু রিপোর্টার তার দিকে ফিরেও চাইলেন না! কিছুই যেন ঘটে নি—এই ভাবে ভুঁড়েল ভদ্রলোক আবার এক খাব্‌লা তেল নিয়ে ভূঁড়িতে মালিশ করতে লাগ্‌লেন।

গণেশ, আনন্দ, অতনুর দল এতক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ্য কর্‌ছিল। ওরা বুঝ্‌তে পার্‌লে, ছেলেটার মনের মধ্যে নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জেগেছে! তাই বুঝি— সে হঠাৎ এমন করে আত্ম হত্যার পথে এগিয়ে গেল।

তৈরী ওদের দেহ আর মন। মুহূর্ত্তের মধ্যে ওরা সবাই কোমরে গামছা বেঁধে ওকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীরে দাঁড়িয়ে একদল বুড়ো-বুড়ী হায়-হায় কর্‌ছিল। এইবার এতগুলি ছেলে এক সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়তে তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

বানের জলের সঙ্গে যুঝে ফটিককে তীরের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে

উত্তাল তোমার দুঃখের ইতিহাস। কিন্তু তুমি ত' নদীর দেশের মানুষ। একথা নিশ্চয়ই জানো যে, নদী যখন এক পাড় ভাঙে তখন সবার অলক্ষ্যে আর এক পাড় গড়ে তোলে। আত্ম-হত্যার পথ আমাদের পথ নয়—আমরা এগিয়ে যাবো জীবনের গান গেয়ে—। ধ্বংস নয়, সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য।

মাষ্টারমশাই এতক্ষণ চুপ করে ছেলেদের কথা শুন্‌ছিলেন। এইবার